

শ্রীগদাধরচরণ নিয়োগী

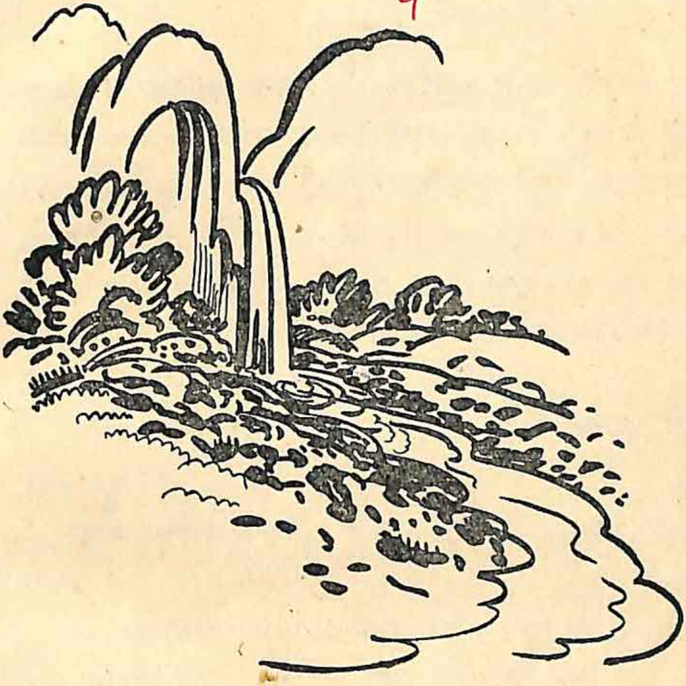
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ

জ্যৈষ্ঠ : ১৩৫৭

দাম : দেড় টাকা

কলিকাতা ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রীকিশোরিমোহন মণ্ডল কর্তৃক নব গৌরাঙ্গ প্রেস, ১০৪, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত



অমিতাভ ভট্‌চাজ মশায় ঠিক ভট্‌চাজ মশায় ছিলেন না। অর্থাৎ আতপ চাল আর কাঁচকলার হিসাব না রেখে তিনি হয়েছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব। টাই-লাগানো ধোপ-দুরস্ত পোষাক পরে তিনি সব সময়েই আফিসের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। আফিসের কথা ছাড়া অন্য কথা তাঁর ভাল লাগতো না। কি করে আফিসের কাজ উন্নততর হবে এইটেই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান।

অবশ্য একটা দুর্ব্বলতা ছিল তাঁর। ভূতের ভয় সব সময় তাঁর মনে দানা বেঁধে থাকতো।

রোজ সন্ধ্যা বেলা তাঁর বাড়ীতে একটা আসর বসতো।

আসরে তিনি আফিসের কথা বলে যেতেন অনর্গল। চা পান সিগারেটের খরচ অবশ্য ভট্‌চাজ মশায়ই বহন করতেন। কাজেই আফিসের একঘেয়ে কথাগুলো সকলকেই বাধ্য হয়ে শুনতে হতো। কথার মোড় ফিরিয়ে দিতে হলে ভূতের গল্পের অবতারণা করতে হতো। ভট্‌চাজ মশায় তখন সরে এসে সকলের মাঝে বসতেন। দেশী বিলাতি সব রকম ভূতই তখন সেই আসরের খোরাক যোগাতো। কাজেই আসরে যাঁরা আসতেন তাঁরা দু' একটা ভূতের কথা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন।

এ বিষয়ে সমীর ছিল তাঁর প্রধান ভক্ত। সমীর কলেজে বি, এ পড়ে। পড়াশোনায় ভাল, কিন্তু শরীর তার দুর্ব্বল।

তাই হয়ত সে ভূতের ভয়ে জড় সড় হয়ে ভূতের গল্প শুনতে ভালবাসতো।

সমীরের ভয় দেখে দাশু তাকে প্রায়ই ক্ষেপাতো। দাশু তার পাড়ারই ছেলে। এবার আই, এস-সি পরীক্ষা দেবে। ছোট ছেলের ডেপোঁমি সমীরের অনেক সময় বরদাস্ত হতো না, কিন্তু দাশুর লম্বা চওড়া চেহারা দেখে তাকে চটাতে সাহস করতো না। কী দজ্জাল ছেলে এই দাশু! পঞ্চমুণ্ডির আসন থেকে সে কঙ্কাল নিয়ে আসতো অমাবস্যার রাতে। তারপর সেটা নিয়ে সমীরের পিছনে লেগে থাকতো। পড়াশুনায় খুব ভাল ছেলে বলে তার অভিভাবকেরাও এ বিষয়ে মাথা ঘামাতেন না মোটেই।

দাশুও এ-আসরে নিয়মিত হাজিরা দিত। আসরে এসে শুনে গল্প হেসে উড়িয়ে দিত সব, তারপর প্রমাণের জন্য পীড়াপীড়ি করতো। ফলে আসর ভেঙ্গে যেতো তাড়াতাড়ি।

ভট্চাজ মশায় মনে মনে একটু বিরক্ত হলেও দাশুকে বিশেষ কিছুই বলতেন না, কেন না আফিসের কথা শোনার এমন শ্রোতা তিনি খুব কমই পান। অবশ্য এজন্য সান্ধ্যভোজনের একটা ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল তার।

সেদিন সন্ধ্যায় আসর বেশ জমে উঠেছে। চায়ের সঙ্গে জল খাবারের বহরটা ভালই আছে, একথা ভট্চাজ মশায় বৈঠকখানায় আসবার আগে সবাইকে জানিয়ে দিতেই মনিবাবু

বলে উঠলেন, আফিসের রকমারি ফাইল আজ নির্ঘাত এসে যাবে। ভট্‌চাজ মশায় আজ নতুনভাবে ফাইল রাখবার নীতি শিখে এসেছেন। আফিসে নাকি তারই পরীক্ষা চলছে আজ। বড় বাবুতো চক্ষু চড়কগাছ করে আফিস থেকে যাবার পথে সেটা আমায় জানিয়ে গেলেন। এখন কতক্ষণ যে এপ্রসঙ্গ চলবে তাই ভাবনা।

বাধা দিয়ে নরেশবাবু বললেন, কোন চিন্তা নাই মণি। আজ খোকার মাসতুতো ভাইয়ের জ্যাঠামশায় এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে। গুণী লোক। সে কালের মানুষ কিনা? একেবারে প্রত্যক্ষদর্শী। কি করে তিনি সশরীরে ফিরে এসে ছিলেন তাই ভাবি—

সকলে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছিল তাঁর?

নরেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, চা আসুক তারপর বললেই ভাল জমবে।

বিনয়বাবু একটু সরে এসে বললেন, আমি যা শুনলুম আমাদের নরেনের কাছে আজ। তার বাড়ীতে নাকি রোজই হাড়গোড় পড়ছে।

দরজা জানলা রোজ বন্ধ করেই সবাই শোয়, কিন্তু কি করে যে ঘরের মধ্যে ঐ হাড়গুলো এসে পড়ে, তা কেউ বুঝতে পারে না। শূন্যে ভেসে-আসা পর্য্যন্ত দেখতে পেয়েছে নরেন। কিন্তু কে ফেলছে তাতো আর চোখে দেখা যায় না। কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করল নরেন, কালীঘাটে পূজোও

দিয়ে এলো ; কিন্তু যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগলো। শেষকালে পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক এক রোজা ডেকে আনলেন, রোজা এসে সরষে ছিটিয়ে বিড়বিড় করে কি-সব মন্ত্র পড়ল, তবে সে ভূত পালায়। যাবার সময় ঘরের ছাদের একটা অংশই ভেঙ্গে ফেলে গেছে। এখনো তার বাড়ীতে গেলে ভাঙ্গা জায়গাটা দেখতে পাওয়া যায়। সেটা আর মেরামত করা হয়ে ওঠেনি এখনো।

সকলে যেন নিশ্বাস বন্ধ করে গল্পটা শুনছিল। এর মধ্যে ভট্চাজ মশায় যে কখন এসে পড়েছেন, গল্প শোনার আগ্রহে কারোই সে খেয়াল হয় নি। মনিবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, তুমি সে ভাঙ্গা ছাদটা দেখেছ?

বিনয়বাবু একগাল হেসে বললেন, দেখিনি কি রকম! আগাগোড়াই ছিলুম যে! ছাদটা একেবারে ধ্বসে গেছে।

সমীর একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, ছাদটার উপর অত রাগ হল কেন ওদের?

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, বোধহয় ঐ দিক দিয়েই বেরিয়ে গেল। যাবার সময় একটা চিহ্ন রেখে গেল হয়তো।

দাশু হেসে বললে, খবরের কাগজে এ খবর ওঠেনি তো?

বিনয়বাবু জোরে হেসে উঠে বললেন, শোনো কথা! দাশুর মতে খবরের কাগজে না উঠলে সেটা সত্যি নয়। আরে খবরের কাগজের কোন সংবাদটা সত্যি। সবই তো শুনে লেখা।

নরেশবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, কোন্ নরেনের কথা বলছো বিনয়? তোমাদের অফিসের নরেন সান্যাল তো?

বিনয়বাবু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, আপনি তাঁকে চেনেন?

নরেশবাবু হেসে বললেন, চিনি না কি রকম? আমার এক নিকট-আত্মীয়ের ভাড়াটে সে। কৈ—

দাশু দুহাত তুলে বললে, থাক্ বুঝেছি, এখন আর হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে হবে না। ঐ যে চা নিয়ে ঢুকছে।

বিনয়বাবু উঠে যাবার উপক্রম করছিলেন। ভট্চাজ মশায় উঠে তার হাতে এক কাপ চা গুঁজে দিলেন।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বিনয়বাবু বললেন দাশুটা ঘোর অবিশ্বাসী। নরেশবাবু একবার আড় চোখে চেয়ে বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বাধা দিয়ে বললেন, থাক্ দাশুর কথা। শোনো এখন আমার জ্যাঠামশায়ের কথা। যথার্থ গুণীলোক তিনি, কত শ্মশানে অমাবস্যার রাত যে কেটেছে তাঁর, এর কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই! ভূতগুলো যেন কলের পুতুলের মতো মেনে চলে তাঁকে! কিন্তু সেবার তাঁকে পড়তে হয়েছিল বিষম ভূতের পাল্লায়। যে করে রক্ষা পেয়েছিলেন! আশ্চর্য্য!! আমার মাসতুতো ভাইতো শুনেই অজ্ঞান! অনেক কষ্টে তার জ্ঞান ফেরানো হয়েছিল।

সমীর নরেশবাবুর কাছে এগিয়ে এলো। ডিমের পুডিং গুলো মুখে পুরেই বললে, ভয়ানক কাণ্ড তো!

নরেশবাবু পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, এটা তোমাদের মস্ত দোষ সমীর। কাণ্ডটা না শুনেই মন্তব্য করে বসো। আর তোমার সামনে এসব বলারও যা বিপদ! হয়ত আবার সেদিনের মত পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে তোমায়।

সমীর একটু লজ্জিত হয়ে দাশুর দিকে তাকিয়ে বললে, আপনায় আজ যেতে হবে না। দাশু রয়েছে।

নরেশবাবু একটা কেক মুখে পুরে বললেন, জ্যাঠামশায়ের এদিকে বরাবরই একটা ভয়ানক ঝোঁক ছিল। তোমরা তো কেউ তাঁকে চেনো না বিনয়, তিনি আসামের জঙ্গলেই অনেক দিন কাটিয়ে দিয়ে এসেছেন। কামরূপ-কামাখ্যা নাকি তন্ত্র-মন্ত্রের জায়গা। শিখেছেনও তিনি অনেক কিছু। গলায় মস্ত বড় রুদ্রাক্ষ মালা, কানে কুণ্ডল, দেখলেই ভক্তি আসে।

মনিবাবু একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, সেদিন কি বিপদে পড়েছিলেন তিনি?

নরেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—বিপদে পড়েছিলেন? কৈ—না? বিপদে পড়বার মত লোক নন তিনি। তবে একটা খারাপ রকমের ভূত অবশ্য তাঁর পেছনে লেগেছিল। আমরা হলে তো তখনই শেষ হতুম। তাঁরা তো হচ্ছেন ভূতসিদ্ধ লোক। তাঁদের আবার বিপদ কি?

সমীর বলে উঠল, তবে যে বললেন, রক্ষে পাবার নাকি উপায়ই ছিল না তাঁর? নরেশবাবু বলতে লাগলেন, অমাবস্যার

রাতে অশরীরী আক্রমণ যে কত বিপজ্জনক তা তুমি কি বুঝবে সমীর ?

ভট্‌চাজ মশায় বললেন, আক্রমণ কখন কি ভাবে হ'লো, খুলে বলুন তো নরেশবাবু।

নরেশবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আজ কি তিথি বলুন তো? ভট্‌চাজ মশায় পঞ্জিকা দেখে বললেন, চতুর্দ্দশী আছে কাল ভোর পর্য্যন্ত। নরেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক, আজ থেকে চৌদ্দ দিন আগের ঘটনা, কিন্তু মনে হয় যেন গতকাল ঘটে গেছে। জ্যাঠামশায় আসছিলেন ঐ মহাশ্মশানের পাশ দিয়ে। একেবারে নিঃসঙ্গ একা। সেই পঞ্চমুণ্ডি আসনের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই……দাশুর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানার দিকে নজর পড়তেই—তিনি আবার বিরক্তিভরে বলে উঠলেন, কি দাশুর বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? নইলে এতে হাসার কি আছে ?

দাশু হাসি চেপে রেখে বললে, না আপনি বলুন শুনতে ভালই লাগছে। নরেশবাবু বিরক্তির সুরে বললেন, সত্যি কথা শুনতে ভালো লাগবারই কথা। এতো বিনয়ের আজগুবি কথা নয় যে, আমার আত্মীয়বাড়ীর ছাদ উড়ে গেল, অথচ আমি জানলুম না—

বিনয়বাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, আমার একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ল। নরেশ দা, আপনার এ কাহিনীটা আর একদিন শুনবো—

নরেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলেছ কোথায় ? শোন আগে কাণ্ডটা।

ভট্‌চাজ মশায় বললেন, ব্যাপারটা খুলে বলুন নরেশ বাবু, কি করে আপনার জ্যাঠামশায় ভূতের হাত থেকে ফিরে এলেন।

নরেশবাবু একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর ধোঁয়াটা ছেড়ে দিয়ে ধোঁয়ার দিকে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, এই যে ধোঁয়াটা দেখতে পাচ্ছেন, একটু পরে আর দেখতে পাবেন না। তার মানে কি বলতে চান ধোঁয়াটা নষ্ট হয়ে গেল ? তা নয়, বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় ; চোখে দেখা যায় না শুধু। প্রাণবায়ুও তেমনি বের হয়ে এসে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়, চোখে আর দেখা যায় না।

দাশু একটু হেসে বললে, আপনার কথা মানতে হলে দেখা যায় বাতাসের সঙ্গে অজস্র ভূত শুধু কিলবিল করে বেড়াচ্ছে মানুষের গলা টিপে ধরবার অপেক্ষায়,—তাই নয় ?

ভট্‌চাজ মশায় বাধা দিয়ে বললেন, তুমি থাম দাশু, নরেশবাবুকে গল্পটা শেষ করতে দাও আগে।

নরেশবাবু বলতে লাগলেন, দাশুটা ঘোর নাস্তিক ; কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না, ভূতগুলো সব বাতাসের মধ্যেই থাকে না। এদের সর্ব্বত্র অবাধ গতি। ধরো আমেরিকায় প্লাঞ্চেট বসালো, এখান থেকে চলে গেল সে ভূত নিমেষের মধ্যে—

মনিবাবু বাধা দিয়ে বললেন, থাকুক সে কথা। আপনার জ্যাঠামশায়ের কথাটা আগে বলুন—

নরেশবাবু একটু থেমে বললেন, পঞ্চমুণ্ডি আসন তো যে সে জায়গা নয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে এর খুবই দরকার। সে কি ভীষণ স্থান। তাতে অমাবস্যার রাত। সারা বাগানটায় অশরীরী প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে—

দাশু বলে উঠলো, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো বুঝি?

নরেশবাবু বিরক্তি ভরে বললেন, তুমি থাম দাশু, প্রেতাত্মা কি, ছেলে মানুষ হয়ে তুমি কি বুঝবে? শ্মশানে তো তোমার যাতায়াত আছে, একবার এদের পাল্লায় পড়লে টের পাবে, —কি ভীষণ এরা! অপদেবতা নিয়ে ঠাট্টা ভাল লাগে না।

সমীর বললে, শুনবেন না নরেশবাবু, ঐ ডেঁপো ছেলের কথা। চুপি চুপি শ্মশানে যেয়েই ভাবে মস্ত বীর সে। ভাল একটা রোজা পেলে ওর পেছনে একটা ভয়ঙ্কর ভূত লাগিয়ে দিতুম আমি। বয়সে ওর চেয়ে অনেক বড় আমি, অথচ আমার পেছনে লাগতেও কসুর করে না,—বুঝবে একদিন।

নরেশবাবু বললেন, থাক সে কথা। শোন জ্যাঠামশায়ের কথা। তিনি ঐপথে আসছিলেন, এমনি সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো কাল একটা অদ্ভুত মূর্ত্তি। বিকট তার চেহারা।

দাশু হেসে বললে এই যে বললেন, তারা অশরীরী, তবে শরীর এলো কোত্থেকে?

নরেশবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, অশরীরীর শরীর ধারণ করতে নিমেষমাত্র লাগে, এবং তোমার মত আর একটা দাশুর মূর্ত্তি নিয়েও দেখা দিতে পারে তারা।

সমীর ভীত হয়ে চারিদিক চেয়ে দেখলো, আর কোন দাশু ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে কিনা।

ভট্চাজ মশায় ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, জ্যাঠামশায় ভয় পেলেন বুঝি?

নরেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—ভয়? ভয় পাবার লোক নন তিনি মোটেই। তবে মূর্ত্তিটাকে চিনতে না পেরে একটু চিন্তিত হয়েছিলেন। মানে সে মূর্ত্তিটার মুণ্ড ছিল না কিনা!

সমীর বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, কবন্ধ ভূত নিশ্চয়ই।

মনিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, বড় জবর ভূত তো, কিন্তু পথ চিনলো কি করে?

নরেশবাবু বলতে লাগলেন, সে মূর্ত্তিটার দেহ থেকে দুটো হাত বেরিয়ে এগোতে লাগলো জ্যাঠামশায়ের দিকে। মোটেই না ঘাবড়িয়ে তিনি স্মরণ করলেন তাঁর পোষা ভূতকে। দুজনে খণ্ডযুদ্ধ লেগে গেল। পঞ্চমুণ্ডির বাগান তোলপাড়! কিন্তু পোষা ভূতটা পেরে উঠলোনা তার সঙ্গে। হাত দুটো এগোতেই লাগলো সে ক্রমাগত।

সমীর রুদ্ধশ্বাসে বললে, তারপর?

মনিবাবু বলে উঠলেন, আশ্চর্য্য সাহস তো আপনার জ্যাঠামশায়ের।

নরেশবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন,—হবে না ? আমার মাসতুতো ভাই অমিত কি যে সে বংশের ছেলে ? তার জ্যাঠামশায় বড় গুণীলোক। তাই দেখে রাখালজ্যাঠা এখন আসামের জঙ্গলেই রয়েছেন।

সমীর বললে, তারপর কি হলো বলে ফেলুন !

দাশু হেসে বললে, আর কি বলবেন ? রমেশবাবুকে আমি চিনি। দিল্লী সেক্রেটারীয়েট থেকে পেন্সন নিয়ে এখন বৃন্দাবনে আছেন, আমার দিদিও তো থাকেন সেখানে। জীবনে আসাম—

নরেশবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি থাম ফাজিল ছোকরা। তোমাকে আর সবজান্তা হতে হবে না। চলো বিনয়, আজ ওঠা যাক্।

সমীর অনুনয় করে বললে; সবটা শোনা হলো না কিন্তু !

ভট্চাজ মশায় বললেন, আর এক কাপ চা আসছে।

নরেশবাবু বিরক্তভাবে বললেন, এই ডেঁপো ছেলেটা—

এমনি সময়ে ভট্চাজ মশায়ের ভায়রাভাই ভীমবাবু এসে পড়লেন। এঁদের সকলেরই পরিচিত তিনি। আমুদে লোক, কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। সকলেই উল্লসিত হয়ে প্রায় সমস্বরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো।

তিনি ধুলো পায়েই একটা কোচ দখল করে বললেন, এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা হোক্ আগে। তারপর নরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি আলোচনা হচ্ছে আপনাদের।

দাশু জবাব দিলে, ভূতের ; সারা পৃথিবীটা জুড়ে ভূতেরা আছে। কোটী কোটী ভূত। সব এসে আক্রমণ চালিয়েছে নরেশবাবুর মাসতুতো ভাইয়ের আর জ্যাঠামশায়ের উপর।

নরেশবাবু বিরক্তিভরে বললেন, এই বাচাল ছেলেটার জন্য কোন কিছু বলার কি উপায় আছে ? নাও এবার ভীমবাবুর কাছে বিশদভাবে শোন। উনিতো মন আর আত্মা নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত থাকেন।

নরেশবাবু বিশেষ কিছু বললেন না। ভীমবাবু আবার দাশুকে বেশ একটু স্নেহ করতেন।

দাশু সহসা প্রশ্ন করে বসলো, ভূত বিশ্বাস করেন ভীমবাবু! ভীমবাবু জোরে হেসে উঠলেন, বিশ্বাস করি না কি রকম ? যা গত হয়েছে তাইতো ভূত ?

দাশু আবার বললে, তাদের অশরীরী আত্মা এসে মানুষকে আক্রমণ করে নাকি ?

ভীমবাবু বলে উঠলেন, অসম্ভব নয়, বিরক্ত করলে সবাই চটে ওঠে। ওরাও চটবে, তা আর বিচিত্র কি ? বাতাস ভেদ করে ফুটে বেরোবে।

দাশু ঠাট্টা করে বললে, ওরা বুঝি বাতাসে কিল্‌বিল্‌ ক'রে বেড়ায় রোগের বীজাণুরই মতো।

ভীমবাবু তেমনি হেসে বললেন, শুধু বাতাসে ? তার উপরে গেলেও দেখা পাবে তাদের। নইলে বিলাতী ভূত এখানে এক নিমিষে আসে কি করে ?

দাশু হেসে উঠলো, তাই বলুন, আপনি ঠাট্টা করছেন।

ভীমবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না ঠাট্টা আমি করি না। ওদের ঠাট্টা করে শেষে বিপদে পড়ে যাই আর কি? রাত-বিরোতে লাইব্রেরী থেকে আসতে হয় আমায়। সব ভূত-ই তো আর ভাল নয়!

দাশু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, আপনি সত্যি ভূত বিশ্বাস করেন? ভীমবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আমার চেয়ে তোমার বিশ্বাসের মাত্রাটা একটু বেশী। ভূত আছে কিনা খোঁজ নেবার জন্য শ্মশান ঘাটে তোমার আনাগোনার কথা আমার ভাল মনে আছে দাশু, কিন্তু এও তো মনের দুর্ব্বলতা।

দাশু লজ্জিত হয়ে বললে, ভূত তো নেই। তাহলে আর ভয়ের কি কারণ আছে। ভীমবাবু বাধা দিয়ে বললেন, নেই তোমাকে কে বললে? তবে মানুষের অপকার সহসা বড় করে না। প্রয়োজন হলে অনায়াসে তাকে দেখানো যায়?

সমীর বলে উঠলো, আমি দেখতে চাই, ভীমবাবু!

নরেশবাবু এই সময় বলে উঠলেন, তবেই হয়েছে? না দেখেই রাত্রে পৌঁছে দিতে হয় তোমায়। দেখলে তো এক পা এগোবে না তুমি।

দাশু একটু জোরের সঙ্গে বললে, আমাকে যদি দেখাতে পারেন, তবে বিশ্বাস করবো,—নইলে নয়।

ভীমবাবু হেসে বললেন, স্কুল কলেজের ছেলেপেলেদের তো আমি ভূত দেখাই নে। ভূতের ত্রিসীমানাতেও তোমাদের

এগোতো দেওয়া হবে না।—তবে নরেশবাবু যদি দেখতে চান.....

নরেশবাবু শুষ্ক মুখে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়! এ দেখতে কার না সাধ যায়? তবে ক'দিন দেহটা ভাল যাচ্ছে না। আর কয়টা দিন পরে দেখলে ভাল হয়। দুর্ব্বল শরীরে হার্টটা—

বিনয়বাবু বলে উঠলেন, থাক্, হার্টটাকে আর নাড়া চাড়া দিয়ে লাভ নেই। আমার হার্ট ভালই আছে। ভীমবাবুর যদি আপত্তি—

ভট্চাজ মশায় বললেন, মানে আমারও ঐ রকম একটা ইচ্ছা রয়েছে অনেকদিন থেকে। আমি দেখতে চাইলে আপত্তিটা হয়ত—

ভীমবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, সবাই দেখছি ভূত দেখবার জন্য উদ্গ্রীব! কিন্তু দেখলে যে ভয়টা একেবারেই ভেঙ্গে যাবে! ভূতের জন্যই এই আসরটা চলে আসছে অনেক দিন থেকে। পড়াশোনার জন্য আমার আসা আর সম্ভবপর হয় না। কিন্তু শুনতে পাই, দুনিয়ায় এমন কোন ভূত নেই—আপনাদের আসরে যার আনাগোনা না হয়। অথচ······ভীমবাবু চুপ করে গেলেন।

ভট্চাজ মশায় কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অথচ কি?

ভীমবাবু মাথা নেড়ে বললেন, থাক্ সেকথা, কিন্তু ভূত দেখার একটা বিপদও আছে, সবাইকে তাই দেখানো যায় না, ভট্চাজকে অবশ্য আমি দেখতে পারি, যদি সে ঘাবড়ে না

যায়। কারণ ভূত দেখার প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'বে আগে। তার একটা ব্যবস্থা দরকার।

ভট্চাজ মশায় বললেন, কি সে ব্যবস্থা বলুন, আমি সব বিষয়ই রাজি আছি।

ভীমবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, এ বিষয়ে কয়েকটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, এইমাত্র। প্রথম কথা, ভূত দেখতে হবে একটা আয়নার মধ্যে। নিজের কল্পিত ভূত এসে দেখা দেবে আয়নার মধ্যে। কিন্তু ভূত দেখলে একটা ভয়ঙ্কর রাগ হবে মনে;—ভূতটাকে দূর করে দেবার একটা অদ্ভুত কল্পনায়। হয়ত আয়নাটাকেই ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা হতে পারে; সেটা করা উচিত হবে না, তাতে ক্ষতি হতে পারে। তা ছাড়া সামনে যারা থাকে, বিশেষতঃ যে সত্যিকার ভূত দেখাল, তার উপর রাগ এসে পড়ে। শারীরিক আক্রমণ ভদ্রতা সূচক হবে না বলে অন্য উপায়ে ক্ষতি করবার একটা আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে। ভূত দেখবার পরেও মনের মধ্যে কোন মালিন্য থাকবে না, এরই একটা প্রতিশ্রুতি চাই।

ভট্চাজ মশায় হেসে বললেন, এতে আর মালিন্য থাকবার কি কারণ আছে। আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই ভীম বাবু। অনেকদিন থেকেই ভূত দেখার একটা আকাঙ্ক্ষা আমার মন জুড়ে আছে। এঁদের গল্প শুনে সে আকাঙ্ক্ষার অনেকটা তৃপ্তি হয়। নিজের চোখে দেখলে আরো তৃপ্তিকর হবে সন্দেহ নেই।

ভীমবাবু হেসে বললেন, তাহলেই তো আর একটা বিপদ দেখছি। ভূত দেখিয়ে শেষটা সান্ধ্য-আসরটা ভেঙ্গে যাক্, আর আমি সকলের অভিশাপ কুড়িয়ে বেড়াই ;— সে হয় না। ভূত একবার দেখলে আর সান্ধ্য-আসর জমবে না নিশ্চয়ই।

ভট্চাজ মশায় বিস্মিত হয়ে বললেন, তাতে আরো জমবে ভাল। সান্ধ্য-আসর বন্ধ হলে কি আমার চলে ?

ভীমবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, তা ঠিক, তোমার আবার আফিসের আলোচনা আছে। ওর জন্য শ্রোতা চাই। ভুলেই গেছলুম সে কথা।

ভট্চাজ মশায় বললেন, সে যাক্, আপনি কবে দেখাচ্ছেন বলুন। আপনি যে চুপি চুপি ভূত চর্চ্চা সুরু করেছেন, তা তো জান্তুম না। যাহোক্, আজই আমি সব ব্যবস্থা করছি। আজই দেখাতে হবে আপনার—

এই সময় চা এসে পড়লো।

ভীমবাবু এক পেয়ালা তুলে নিলেন, তারপর এক চুমুক দিয়ে বললেন, আজ ! আজ কি করে হয় ? মানে ওদের তো যখন তখন ডাকা উচিত নয়। অমাবস্যা ছাড়া ওরা বড় যাতায়াত করে না।

ভট্চাজ মশায় তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, অমাবস্যা তো কাল ভোর থেকেই সুরু হবে। তবে কালকেই হোক্।

ভীমবাবু নিশ্চিন্ত মনে চা পান করতে লাগলেন। চা পান শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। তারপর স্মিতমুখে বললেন, এসব জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া কি ভাল? ছেলে-পেলেরা হাসবে? তা ছাড়া ভূত-বেতাল দেখে ভয়ও হতে পারে। সাহস দেবার জন্য একজন লোক দরকার হবে। সেও খুব শক্ত লোক হওয়া চাই।

মণিবাবু বললেন, কেন আমাদের দাশু রয়েছে তো! ডাক্-সাইটে ছেলে, ভয়ের লেশও নেই।

ভীমবাবু সিগারেটটার ছাই ফেলে দিয়ে বললেন, না ওসব এখন থাক্, শেষে ভট্‌চাজ আমার উপর চটে যাবে। আত্মীয়ের মনোকষ্ট—

ভট্‌চাজ মশায় বাধা দিয়ে বললেন; আপনি বরঞ্চ না দেখালেই আমার চটে যাবার সম্ভাবনা বেশী। আপনি চিন্তা করবেন না মোটেই। ভূত আমায় দেখতেই হবে। আপনার কোন ওজর আর শুনছিনে।

ভীমবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বেশ তা' হলে প্রতিশ্রুতির একটা চুক্তিনামা আমি চাই। শেষে অস্বীকার করে বসবে, সেটা ভাল দেখাবে না।

ভট্‌চাজ মশায় অফিস-দুরস্ত লোক। তখনই ঝরণা-কলম বের করে খস খস করে প্রতিশ্রুতি পত্র লিখে দিলেন।

ভীমবাবু একটু হেসে সেটা নরেশ বাবুর হাতে দিয়ে বললেন, এটা আপনার কাছেই থাক্ এখন। কাল সন্ধ্যার

পরে এটা দরকার হবে। দাশু কাল বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করো। কয়েকটা ব্যবস্থা করা দরকার হবে।

মানে কাল সন্ধ্যার পরই আমি চলে আসবো তৈরী হয়ে। চায়ের ব্যবস্থাটা যেন ভাল ভাবেই থাকে। নইলে ওদের আবার ডেকে আনা মুস্কিল হবে! কিন্তু আমরা যে ক'জন আছি এর বেশী একজনও লোক যেন না হয়।

পরদিন সন্ধ্যার সময় দেখা গেল ভীমবাবুর নিষেধ সত্ত্বেও জন পনেরো হাজির হয়েছে ভট্চাজ মশায়ের বাসায়। এঁদের ভাবটা দেখলে মনে হয়, যেন ভূতের সঙ্গে একটা বোঝা পড়ার জন্য যেন তাঁরা তৈরী হয়ে এসেছেন।

বৈঠকখানায় কি কি রকম ভূত দেখেছিলেন তারই নানা ফিরিস্তির আলোচনায় সবাই ডুবে ছিলেন, এমন সময় ভট্চাজ মশায় এসে ঢুকলেন। সবাই সমস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কৈ ভীমবাবুকে তো দেখা যাচ্ছে না। ফাঁকি দিলেন নাকি শেষে?

ভট্চাজ মশায় হেসে বললেন, না, অনেক আগেই তিনি এসেছেন। ঘরের মধ্যে কি সব প্রক্রিয়া করছেন দাশুকে নিয়ে। আমাদের কারো-ই যাওয়া নিষেধ সেখানে। একেবারে দরজা জানলা বন্ধ।

নরেশবাবু মুখ শুকিয়ে বললেন, তাহলে সত্যিই হয়-তো ভূত এসে পড়বে এ বাড়ীতে। মানে ভেবে ছিলুম ভীম বাবু ঠাট্টা করছেন। আমার আবার হার্টটা।

মণিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, তবে এলেন কেন? আপনার হার্টের জন্য আমরা ভূত দেখবো না, এ হতে পারে না। আপনি বরঞ্চ এই সুযোগে সরে পড়ুন।

নরেশবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, তাই যাই, অফিস থেকে আর বাসায় ফিরতে পারিনি আজ। মানে হার্টের অসুখ কি না, একটু চা না হলে—

বিনয়বাবু তখনই বললেন, আদত কথাটা—

ভট্চাজ মশায় তড়াতাড়ি বলে উঠলেন, এই চা এসে পড়ল বলে।

এমনি সময়ে ভীমবাবু এসে পড়লেন। তাঁকে যেন আর চেনাই যায় না এখন! গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে গরদ, গায়ে নামাবলী। পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো। সকলেই সসম্ভ্রমে নমস্কার করলেন তাঁকে।

একটা কৌচে বসে তিনি বললেন, এখন তো চায়ের ব্যবস্থা করা দরকার।

মণিবাবু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে-তো হ'চ্ছেই, কিন্তু ওদিকে কতদূর এগোলেন। ভূত কি আসবে আজ, কবন্ধ না ব্রহ্মদৈত্যি?

ভীমবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আপনাদের মতো সব ভূত চিনে নেবার ক্ষমতা এখনো হয় নি আমার। তবে ভট্চাজ মনে মনে যে ভূত চিন্তা করবে, তাকেই সে দেখতে পাবে। আয়নায় কবন্ধ ভূত দেখেছেন নাকি আপনি?

মণিবাবু তৎক্ষণাৎ বল্‌লেন, আমি নয়! নরেশবাবুর মাস্‌তুত ভাইয়ের জ্যাঠামশায়। হাতদুটো তার এগিয়ে আস্‌ছিল শুধু—

ভীমবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, তাই বলুন। দাশুর কাছে আমি সে কথা শুনেছি, কিন্তু বৃন্দাবনে—

নরেশবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, ঐ যা, আজ আবার মেজ শ্যালকের আসবার কথা সন্ধ্যার পরে, আমার তো উঠতে হলো এখন—

ভীমবাবু একটু হেসে বললেন, বেশ-তো, চা আস্‌ছে, খেয়েই যাবেন। অবশ্য ছাদ ভাঙ্গার ভয় নেই এখানে। কি বলেন, বিনয়বাবু!

বিনয়বাবু শুষ্ক মুখে বললেন, না আয়নার মধ্যে দিয়ে এলে ছাদ আবার ভাঙ্গবে কোত্থেকে!

তারপর নরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, নরেশবাবু ঐযে কাল বলেছিলুম আপনাকে, জলধরবাবু আসবেন আমার বাসায় সেই দলিলটা নিয়ে। হয় ত' তিনি অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। হঠাৎ চলে গেলে বহু টাকা লোকসান হ'বে; আমারও উঠতে হলো এখন।

ভীমবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, ঐযে দু'জন উঠবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন দেখছি; কিন্তু এখন যাওয়াটা আপনাদের পক্ষে ভাল হবে কি? চায়ের মায়া না হয় ছেড়েই দিলেন, কিন্তু আজ এই অমাবস্যার রাতে কত

ভূতের আমদানী হয়েছে এই বাড়ীতে। দেশী বিলাতী নানা রকম। ভট্চাজ যে কখন কাকে মনে করে বসে বলা যায় না। তাদের অবশ্য অনেকেই ঘুর্ছে এই বাড়ীটার আনাচে-কানাচে। অবশ্য এ বাড়ীটায় কোন ভয় নেই, কিন্তু বাইরে গেলে দুই একটা যদি সত্যিই পিছু নেয়, বলা তো যায় না কিছু।

সবাই জড়সড় হয়ে বসে পড়লো।

চা পান শেষ করে ভীমবাবু সবাইকে সঙ্গে করে একটা ঘরের কাছে নিয়ে এলেন। ঘরটা তালা বন্ধ ছিল, দাশু সেটা খুলে ফেললো। ভট্চাজ মশায় বললেন, স্থইচটা টিপে দাও দাশু!

ভীমবাবু হেসে বললেন, অন্ধকার ছাড়া এদের আগমন তো হয় না। সময় হলে আমিই বলে দেবো সেটা।

দাশু অন্ধকারের মধ্যে ভট্চাজ মহাশয়ের হাতে একটা কাপড় গুঁজে দিয়ে বললে, এই গরদটা পরে ফেলুন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো, ভয় করবেন না মোটেই।

ভট্চাজ মশায় গরদ পরে নিলেন। দাশু তাঁর গলায় একটা রুদ্রাক্ষ মালা দিয়ে দিল, তারপর নামাবলীটা চড়িয়ে সেই অন্ধকারেই একটা আসনে গিয়ে বসলো।

ভীমবাবু সবার মাথায় সরষে ছিটিয়ে দিলেন। ভট্চাজ মহাশয়ের মাথায় পড়লো প্রায় পোয়া-খানেক। তারপর বিড় বিড় করে কি সব সংস্কৃত ভাষায় বললেন, যার উচ্চারণ

শুনলে সংস্কৃত ভাষা বলেই মনে হয়, কিন্তু কোন অর্থ হয় না।

দাশু ক্রমাগত 'ভয় নেই' 'ভয় নেই' বলে গুরুগম্ভীর শব্দে সাহস যোগাতে লাগলো।

এমনি প্রক্রিয়া চললো মিনিট পাঁচেক। তারপর ভীমবাবু একটা চক বের করে একটা রেখা টেনে দিলেন ভট্‌চাজ মশায়ের চারধারে। তারপর একটা সুট্‌কেশের ভেতর থেকে বের করলেন মস্ত একটা কাঁচ। ভট্‌চাজ মশায়ের সামনে তিনি কাঁচটাকে রেখে বললেন, এই ত্রিকোণ কাঁচটির উপর হাত রাখতে হবে। একেই অবলম্বন করে ভূত আসবে। শেষে আশ্রয় নেবে আপনার ভেতর। কাঁচটা খুব পালিশ। জোরে চেপে রেখো এটা।

ভট্‌চাজ মশায় জোরে চেপে ধরলেন কাঁচটা।

বাইরে থেকে বিনয়বাবু বলে উঠলেন, এ অনেকটা প্ল্যাঞ্চেটে ভূত আনার মতো।

নরেশবাবু রুদ্ধশ্বাসে বললেন, কত বড় গুণী লোক দেখেছ?

ভট্‌চাজ মশায় তাদের কথা শুনে আরও তটস্থ হলেন। ভীমবাবু এমনি সময় বললেন, এখন হাত দুটো মুখের উপর রেখে ভূত দেখার কল্পনা করো। খুব নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে হবে কিন্তু। ভট্‌চাজ মশায় মনে মনে দৃঢ়ভাবে ভূতকে আকর্ষণ করে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এমনিভাবে প্রক্রিয়া চললো বার বার। কখনো বা মুখে,

কখনো বুকে, কখনো বা ঘাড়ে, কখনো বা কর্ণে হাত রেখে একান্ত মনে ভূত দেখার সাধনা চললো ভট্চাজ মশায়ের।

মিনিট পনেরো এমনি ভাবে চলার পর ভীমবাবু গম্ভীর সুরে বললেন, এখন আয়নাটা মুখের সামনে ধরতে হবে। আমি সুইস্ টিপে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভূত দেখা যাবে আয়নার ভেতর। দাশু তুমি হুঁসিয়ার হয়ে আয়না নিয়ে নিও; ভেঙ্গে না যায় সেটা। ভট্চাজ যেন অজ্ঞান না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখো। ভূত এসে গেছে আয়নায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আর যাঁরা দেখতে চান ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ুন। ভট্চাজ প্রতিশ্রুতির কথা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। নরেশবাবু সে চুক্তিনামা দিন্তো।

সবাই ভয়ে-ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। নরেশবাবু একহাতে হার্ট চেপে আর হাতে কাগজটা এগিয়ে দিলেন।

সুইস্টা টিপে দিলেন ভীমবাবু।

সত্যিকারের এক অপরূপ ভূত দেখা গেল; সর্ব্বাঙ্গে মুখে কানে ভূষা-কালী মাখা চেহারায় দাঁড়িয়ে আছেন ভট্চাজ মশায়। ত্রিকোণটার তেলকালী সবটাই উঠে এসেছে ভট্চাজ মশায়ের হাতের সঙ্গে। চাপা হাসির সঙ্গে সঙ্গেই আয়নাটায় মুখের চেহারা দেখে ভট্চাজ মশায় তেড়ে এলেন ভীমবাবুর কাছে। দাশু তাড়াতাড়ি আয়নাটা নিয়ে নিল।

ভীমবাবু সহাস্য বদনে খানিকটা সর্ষে তাঁর মাথায় ছিটিয়ে দিলেন।

ক্লাব সরগরম। তাসের ব্রিজ খেলা জমে উঠেছে খুব। চারজন খেলছেন আর ষোলজন ঝুঁকে পড়ে রয়েছেন তাসের দিকে। অমলবাবু 'নোট্রাম্পস্' এর 'রি ডবল' খেলার সিরিজ টানতে টানতে বাধা পেলেন এসে হরতনের বিবির কাছে। রিস্ক তার টিকলো না। প্রতিপক্ষ উল্লসিত হয়ে তাঁদের সিরিজ ক্রমাগতই টেনে চলেছেন। কত যে ডাউন হবে তার ঠিক নেই।

এমনি সময়ে এসে পড়লেন নির্ম্মলবাবু হন্তদন্ত ভাবে।

অভ্যস্ত ছিলুম ব্যাপারটায়। এমনি ভাবেই আবির্ভাব তিরোভাব তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সব সময়েই তার যেন একটা চঞ্চল ভাব। রোজই একটা চিত্ত-চমকপ্রদ সংবাদ তার কাছে থাকে। হিরোসিমায় বোমা পড়া থেকে কামস্কাটকায় কোন বাগানে কতটা আলু হয়েছে সংবাদ-পত্রে দেখলেই সেটা কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। আজকার সংবাদটা জানবার জন্য সকলে একবার তার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর পাল্টা সিরিজ যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

নির্ম্মলবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাসগুলো লণ্ডভণ্ড করে বললেন, এখনও তাস খেলা চলছে, এদিকে যে ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেল, অত্যাশ্চর্য্য—

চিড়ার সিরিজটা ব্যর্থ হলো দেখে সত্যকিঙ্করবাবু বিরক্তি-ভরে বললেন, রেখে দাও তোমার অত্যাশ্চর্য্য, কমসে কম

আটশো হতো ডাউন, আর তুমি কিনা এই সময়ে এসে লঙ্কাকাণ্ড—

অমলবাবু আর কথাটা শেষ করতে দিলেন না। একটা নিষ্কৃতির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, ভূমিকাটা ছেড়ে একবার আসল কথাটা বের করো দেখিনি, কি ভীষণ কাণ্ড তোমার খুলে বলতো!

দেবেনবাবু দাবা খেলছিলেন, ঘোড়ার আড়াই চালে রাজা কিস্তিমাৎ করে বসেছেন। তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, কি কাণ্ড ভায়া? রাস্তায় বায়স্কোপের কিউ দেখে এলে বুঝি?

নির্ম্মলবাবু উত্তর দেবার চেষ্টা করতেই যদুবাবু বলে উঠলেন, থামো নির্ম্মল, বায়স্কোপের কিউতো আকারে ছোট, কিউ দেখতে হলে যেতে হয় ষ্টেশনে। দেখবে কিউ ল্যাজ চলে গেছে কতদূর! এ আবার একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড কি? আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখতে চাওতো চলো আমার শ্বশুরবাড়ী ধুবড়ীতে—

সতীশবাবু পাশা ফেলে উঠে এলেন, যদুবাবুর শেষের কথা তার কানে এসেছিল। বললেন, কি আশ্চর্য্য কাণ্ড হচ্ছে তোমাদের। শোন কথা। মজার কাণ্ড ঘটেছিল আমার বড় সম্বন্ধী—

নির্ম্মলবাবু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, ও সব শ্বশুর সম্বন্ধী এখন থাক দাদা, আমাকে কাণ্ডটা খুলে বলতে দিন আগে।

এ-দিকের কাণ্ডটা সত্যিই দারুণ, অসম্ভব,—অবিশ্বাস্য, অথচ বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। অকাট্য প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে।

সঁকলেই আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, ব্যাপারটা কি ?

বলছি, নির্ম্মলবাবু পকেট থেকে বালি কাগজের একটা খাম বের করলেন, তারপর একটা লাল চিঠি বের করে বললেন, এই দেখুন টেলিগ্রাম, এতো আর আজগুবি খবর নয়, একেবারে সরকারী ছাপ মারা টেলিগ্রাম। আমাদের পূর্ণদা রায় সাহেব হয়েছেন!

হুলুস্থূল কাণ্ড বেধে গেল। যে-যার আসন ছেড়ে ঝুঁকে পড়লেন টেলিগ্রামটার উপর। পিংপং, ডিক্লেয়ার, ব্রিজ, দাবা, পাশা কোনটার মায়ায় আর কাউকে আটকে রাখতে পারলো না। খেলার তাস গুটি সব ছিটকে পড়লো। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারো। খবরটা যেন সবার মনে একটা বিস্ময়ের ভাব এনে দিয়েছিল।

তাইতো!

আমাদের পূর্ণদা! এক-একটা পয়সা যাঁর হৃৎপিণ্ডের এক-একটা অংশ, টান দিলে গোটা হৃৎপিণ্ডটাই বেরিয়ে আসবার উপক্রম করে।

একটা পয়সা কোন ভিক্ষুককে দিয়েছেন একথা তাঁর খুব মিত্রও বলতে পারেনা। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর পাশ দিয়েও যাঁর গতি বিধি নেই কোনকালে, আর তিনি হয়ে

গেলেন খোসামুদে বড় লোকদের একান্ত ঈপ্সিত সাধনায় ধন। রায় সাহেব উপাধি পেতে কত খোসামোদের তৈল খরচ হয়, এতো কারও অজানা নেই।

আশ্চর্য্য হলেন সব চেয়ে বেশী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট যদুদত্ত মশায়। লাট সাহেবের সম্বর্দ্ধনার চাঁদার খাতায় অনেক হাঁটাহাঁটি করে যার কাছ থেকে চার আনা পয়সা পর্য্যন্ত আদায় করা যায়নি, তিনিই হলেন রায় সাহেব! হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, পশার নমোনমো! একবার কেউ ফাঁকি দিতে পারলে আর পয়সা দেবার নামটিও করে না। তবে পূর্ণদার হাত এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। লোক-চক্ষুর অন্তরালে তাঁর ঔষধ তৈরী হয়। চির বিশ্বাসী কমপাউণ্ডারটি ছাড়া অতি নিকটতম আত্মীয়-স্বজনও জানতে পারে না কি ঔষধ দেওয়া হল। এমনই গোপনীয় ভাবে চলে তাঁর ঔষধ দেওয়া কারবার। কিন্তু এ সব তো রায় সাহেব হবার লক্ষণ নয়;—যে পূজার উপচারের জন্য দত্ত মশায় বছরের পর বছর ধরে অনারারী হাকিমী করে আসছেন। অথচ এই পূর্ণদার ভাগ্যেই শিকা ছিঁড়লো। পূর্ণদার কোন মামা অন্তরাল থেকে তদ্বির চালাচ্ছেন, তা জানবার জন্য দত্ত মশায় ভেতরে ভেতরে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

পরেশবাবু সুবিধাবাদী লোক। সময় বুঝে মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মত যেতো বদলে। নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের জনহিতকর কাজে উৎসাহ দেখে তিনি সম্প্রতি নেমে

ছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাঁদার খাতা অবলম্বন করে। ছোট খাট হাকিমদের পেছু পেছু তাকে ঘন ঘন দেখা যেতো। চাঁদা দেবার ভয়ে দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়ে পেছনের দরজা দিয়ে সবাই সরে যেতো। সামনে পড়লে অবশ্য রেহাই থাক্‌তো না। হাকিম থাকতো সঙ্গে, অনিচ্ছার সঙ্গে একটা রসিদ নিতে হতো। পূর্ণদার কাছে অবশ্য তার স্ঁচ ফোটেনি। তাই একটু হেসে বললেন, এ আমি জানতুম ভায়া। আমাদের খাতায় অষ্টরম্ভা হলেও তলে তলে যুদ্ধের মোটা চাঁদা দিয়েছে নিশ্চয়। ত ছাড়া ওর মামাতো ভাইয়ের শালা আবার বড় লাটা সাহেবের সিমলে অফিসের কেরাণী। ওরা হয়তো রাজটিকার একটা—

টেলিফোনটা হাতে হাতেই ঘুরছিল এতক্ষণ। দেবেন বাবু সেটা তুলে নিয়ে এই সময় বলে উঠলেন, গবেষণা এখন থাক দাদা, ব্যাপারটা যে ভাবেই হোক্‌ ঘটেছে যখন, তখন এর একটা বিহিত করা দরকার। পূর্ণদা আমাদেরই ক্লাবের একজন অনারারী সভ্য, মানে এখনও ক্লাবের চাঁদা বাকী রয়েছে তিন বছরের। এই সুযোগে চাঁদা আদায়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আরো কিছুও এই সুযোগেই আদায় করতে হবে।

যদুবাবু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, তবেই হয়েছে। দেবে'খন এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইয়ে। পাঁচ

পয়সায় ষাট ডোজ হয়, সুতরাং অল্পের উপর দিয়ে যাবে সেটা।

নির্ম্মলবাবু একটু হেসে বললেন, পূর্ণদার মেজ্জাজটা দেখলুম মরুভূমির ওয়েসিসের মতো। পান্থপাদপের গাছ গজিয়েছে প্রচুর। সুযোগ বুঝে খোঁচা দিলে সুস্বাদু রস বেরোবে সন্দেহ নেই। রাজটিকার মহিমা তো সোজা নয়! আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন, 'শ্রী' নামের আগে লেখাই তাঁর অভ্যাস, রায় সাহেবের সঙ্গে শ্রী লেখাটা রেওয়াজ আছে কিনা। বলে ফেললুম, বিশ্রী হওয়াটাই সব চেয়ে ভাল। এতে উপাধির মহিমা ঘোষিত হবে আরো বেশী।

সতীশবাবু ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললেন, আরে! ঐসব বিশ্রী উপাধি আমার দু'চোখের বিষ। নইলে আমার বড় সম্বন্ধী—

নির্ম্মলবাবু বিরক্তির ভান করে বললেন, আবার বড় সম্বন্ধী! তার চেয়ে বরং একবার পূর্ণদার ওখানেই ঢুঁ মারা যাক। আমাদের জন্য আকুলি বিকুলি করছেন তিনি।

ডিস্‌পেন্সারী ঘরটা একটু সাজিয়ে গুছিয়েই বসেছিলেন পূর্ণদা। বহুকালের একটা পুরানো ইজিচেয়ার টেনে এনে টেবিল ক্লথ দিয়ে ঢেকে দেওয়ায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির বিফল প্রয়াস উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। টেবিলের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রংচটা কাপড়ের ফুলগুলো তৈল নিষিক্ত ফরাসের কাপড়ের চেয়েও মলিন দেখাচ্ছিল। পূর্ণদা ঘরটাকে কি

ভাবে সাজাবেন ঠিক করতে না পেরে ক্রমশই বে-গোছাল হয়ে পড়ছিলেন। এমনি সময়ে সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে ফরাসের উপরেই বসে পড়লেন। জীর্ণ নড়বড়ে তক্তা-পোষটা একবারে মচ করে উঠে দেয়ালে বাধা পেয়ে কাত হয়ে রইলো। অন্য দিন হলে দাম না দিয়ে হয় তো পূর্ণদার হাত এড়ানো যেতো না; কিন্তু আজ তিনি সেটা দেখেও দেখলেন না।

দেবেনবাবু বলে উঠলেন, খবরটা শুনেছি পূর্ণদা, আজ আর ছাড়ছিনে আমরা। সোজা কাণ্ড তো নয়! কত শত বড়লোক হাজার হাজার টাকা খরচ করে হিম্ সিম্ খেয়ে যায়; আর তুমি টেক্কা দিলে তার উপর। এবার টাকার থলিটা খেলো একটু। জমিয়েছে তো সারা জীবনে মোটা ভাবের। রায় সাহেব উপাধি তো আর সোজা নয়!

পূর্ণদা খুসী হয়ে বললেন, নির্ম্মলের কাণ্ড! টেলিগ্রামটা আমাকে ভাল করে পড়তেও দিলেনা! মানে পড়বার আগেই—"

নির্ম্মলবাবু বিস্ময়ের ভান করে বললেন, সে কি পূর্ণদা টেলিগ্রামটা এসেছে তো দুপুরে তোমার কাছে। সারা দুপুরটায় যে তুমি টেলিগ্রাম পড়োনি তা আমি জানবো কি করে! আর তুমিই তো টেলিগ্রামটা আমার হাতে দিয়ে পাঠালে সুসংবাদটা ক্লাবের সবাইকে জানানোর জন্যে।

পূর্ণদা একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, রোগীদের যা ভিড়

হয়েছে আজকাল। সময় পাই কখন বলতো! রোগী দেখতে দেখতে আর ওষুধ দিতেই তো দুপুর, আর বিকেল যে কখন কেটে গেল তা, যেন টেরই পেলুম না। আর আমার কাছে যা আসে সব কঠিন কেস। শেষ সময় ছাড়াতো আর কেউ আসতে চায় না। টেলিগ্রাম পড়ি কখন? তোমায় দেখেই তাই টেলিগ্রামের কথা মনে হলো। পড়বার উপক্রম করতেই—"

নির্ম্মলবাবু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, বাঃ পূর্ণদা। তবে যে বললেন, আজ আপনার একটা কেসও হয়নি। নাড়াচাড়ায় টেলিগ্রামের চেহারা যা হয়েছিল! অথচ—"

দেবেনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, তুমি থামো নির্ম্মল! বড্ড তার্কিক হয়েছো তুমি। না পূর্ণদা! আমরা ভারী খুসী হয়েছি একথা শুনে। যাক সে কথা। চটপট করে যোগাড় করো দিকিন একটু ভাল করে আমাদের সবাইকে মিষ্টিমুখ করে দিতে। আমাদের ক্লাবের কথা মনে আছে তো। তিন বছরের চাঁদা বাকী পড়েছে তোমার। সেটা শুধু শোধ করে দিলেই চলবে না। ক্লাবে একটা বিশেষ দান এই উপলক্ষে দিতে হবে তোমায়। কম পক্ষে পাঁচশ টাকা।

সতীশবাবু বললেন, এর পরে ভাল করে একটা ভোজ দিতে হবে। বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, ঢাকার অমৃতি, সের-পুরের আর নাটোরের কাঁচাগোল্লার ব্যবস্থা তো চাই-ই। তোমার অসুবিধা হয়, টাকাটা আমার বড় সম্বন্ধীকে—

নির্ম্মলবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, ঐ রে আবার বড় সম্বন্ধী সুরু হ'লো। পূর্ণদা যা করবেন, তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। নইলে বড় সম্বন্ধীর ভয়ে এখান থেকে আমায় পালাতে হবে।

পূর্ণদা হেসে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়, সাধ্যমতো মিষ্টি-মুখের ব্যবস্থা তো করতেই হ'বে। তবে সতীশবাবুর কথামত ব্যবস্থা হবে আর একদিন; এখানে তো আর সবগুলো জিনিষ একসঙ্গে পাওয়া যাবে না। সময় পেলে এ ব্যবস্থা করতে বেশী বেগ পেতে হবে না। তখন সবাইকে অবশ্য একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে। আর দেবেনবাবুরও চিন্তার কোন কারণ নেই। ক্লাবের চাঁদা আমি সব দিয়ে দিচ্ছি এখনি। তবে পাঁচশো টাকাটা একসাথে দিতে পারবো না। এখন তিনশো দিচ্ছি।

ভূতের মুখে রাম নাম! সবাই অবাক্ হয়ে গেলেন; আশ্চর্য্যের মাত্রাটা আরও বেশী হলো যখন মিষ্টিমুখের পর সত্যি সত্যি তিনশো টাকাই এনে দিলেন পূর্ণদা দেবেন বাবুর হাতে।

কিন্তু ঘটনাটা এখানেই শেষ হলো না। কি ক'রে যেন সালঙ্কারে সমস্ত ব্যাপারটা সহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সমস্ত সহরটা যেন ভেঙ্গে পড়লো পূর্ণদার বাসায়। দেখা গেল ফুলেশ্বরী নাট্য-সমিতির সম্পাদক ভক্তবাবু, কালীতলা পূজা সমিতির ভূপেনবাবু, বাদুড় পাড়ার

যুবক সমিতির বিশুবাবু ও টাউন শ্মশান সমিতির আচার্য মশায়, এমনি সব গণ্যমান্য লোকও জুটেছেন। এমন কি রিক্সা সমিতির সম্পাদক ও যাত্রা-সংঘের সভাপতি মশায়ও বাদ যাননি। এমনি ভাবে সম্পাদক ও সভাপতির ভিড় ক্রমেই বেড়ে চললো তাঁর ডিস্‌পেন্সারীতে। বেলা বেড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা মহিলা সমিতির লোক ও বহু মহিলাও এসে জড়ো হলেন। এদের সকলের হাতেই একটা চাঁদার খাতা। কেউ বা এনেছেন ছাপানো রসিদ, কারও রয়েছে হাতে লেখা—সিল দেওয়া, প্রত্যেকেরই একটা মোটা অঙ্কের দাবী। রসিদ লেখা পর্য্যন্ত শেষ ; শুধু ছিঁড়ে নেবার অপেক্ষা মাত্র!

পূর্ণদা মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলোর চার আনা ডোজে সব গুলো ঔষধ বিক্রী হলেও এঁদের দাবীর একাংশ মিটবে কি না সন্দেহ : এদের দাবীর বহর যেমন, জেদও তেমনি। সহসা খালি হাতে যে কেউ উঠবে, এমন কোন ধারণাও হলো না তাঁর। অথচ কিছু কিছু না দিলেও চলে না। এখন যে সে লোক নন তিনি, একেবারে রায় সাহেব! কিন্তু এঁদের চাঁদার খাতার অনন্ত সংখ্যা আর সাধ্যাতীত দাবীর পরিমাণ দেখে পূর্ণদা মুষড়ে পড়লেন। কি কুক্ষণেই যে উপাধিটা এসে জুটল। একবার ভাবলেন, এটা ছেড়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু ছেড়ে দেবার জিনিষ কি এটা?

ম্যাট্রিক পাশ করতে না পেরে পূর্ণদার একটা চিরন্তন আক্ষেপ ছিল। তবুও তো এই উপাধি তার আক্ষেপে একটা শান্তির প্রলেপ দিল। বি, এ; এম্, এ ডিগ্রীর চেয়ে কম নয়তো এটা। না, চাঁদার একটা ব্যবস্থা করতেই হ'বে। এঁদের সবারই তো আবার কালেক্টর সাহেবের কাছে আনা-গোনা আছে। সবারই তো রায় সাহেব হ'বার একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে

পূর্ণদার মনে পড়লো, ভাগ্যিস্ মেয়ে বিয়ে দেবার যৌতুকের টাকাটা তিনি পোষ্টাফিস থেকে তুলে এনে রেখে ছিলেন। মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে। বিয়ের সব ঠিকঠাক। বিয়েটা না-হয় কিছু পেছিয়েই গেল! উপায় কি? রায় সাহেব হয়ে তো আর এসব মান্য অতিথিদের নিরাশ করা চলে না। আর হয়ত এর পর বিয়ের যৌতুকও দিতে হবে না। রায় সাহেবের মেয়ে! সোজা কথা নয়ত। তার আবার যৌতুক কি?

নূতন করে সবাইকে আবার রসিদ কাটতে হলো। পূর্ণদা সকলকে নানা রকমভাবে বুঝিয়ে চাঁদার মাত্রাটা কমাতে সুরু করে দিলেন। সবাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন এমনি একটা ভাব দেখিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে চাঁদা নিলেন, কিন্তু কাউকেই না নিয়ে যেতে দেখা গেল না।

কিন্তু তাতেও কুলোলো না। গৃহিণীর কিছু গয়না পেছন দরজা দিয়ে জুয়েলারীর দোকানে দিতে হলো নগদ টাকার

পরিবর্ত্তে। কিন্তু তবুও তো লাভ। এত কম খরচায় রায় সাহেবী বজায় রাখা কি সহজ কথা। এরপরে অবশ্য দরবারের দিন আর এক দফা ভোজের খরচ আছে। তার জন্য অবশ্য আরো কিছু গয়না মজুতই রইলো। রায় সাহেবী বড় লোক হতে হলে এ সব তো অঙ্গের ভূষণ করতেই হবে।

আবার এক দফা আগমনের ব্যবস্থা দেখে পূর্ণদা তাঁর জীর্ণ সাইকেলটা টেনে বের করে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, বোসো ভাই তোমরা; আমি একটা কল সেরে আসছি। শক্ত কলেরা কেস; দেরী করবার তো উপায় নেই। এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা স্যালাইন দিয়ে কেসটা খুব খারাপ করে দিয়েছে; আর আমার কাছে রোগী আসে কি না একেবারে শেষ সময়ে।

পূর্ণদা সাইকেলে উঠে অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা সুরু করলেন। সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরলে বাকি গয়না ক'টিও আর রাখা যাবে না। আজকের দিন পথে পথেই কাটাতে হবে তাঁকে। আহারও হয়ত জুটবে না কপালে। রোগীপত্রও তাঁর কমই আজ। কলেরা কেসের দোহাই না দিলে চাঁদাপ্রার্থীর চক্রব্যূহ এড়ানো তাঁর পক্ষে কঠিন হতো।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আত্মগোপন করে অনাহার-ক্লিষ্ট দেহ নিয়ে পূর্ণদা ডিস্‌পেন্সারী ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন সহরের সেরা ডাক্তার রায় চৌধুরী মশায় বসে

রয়েছেন তাঁর অপেক্ষায়। পূর্ণদার মুখ গেল শুকিয়ে। একে বড় ডাক্তার, তা ছাড়া সহরের নামজাদা লোক তিনি। এবার রায় সাহেব কি রায় বাহাদুর হবেন একথা মুখে মুখে শোনা গেছে। এ ছাড়া সরকারের এমন তহবিল নেই যে যাতে তিনি কিছু দান করেন নি। কোয়েটার ভূমিকম্প থেকে হললুলুর চ্যারিটী শোর চাঁদার খাতায় নাম আছে তাঁর। সহরের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তাঁর নাম জড়িত আছে। তাতে তিনি চাঁদা দেন বা না দেন কিছু আসে যায় না। নানা প্রতিষ্ঠানের চাঁদার খাতা তাঁর ডিস্‌পেন্সারীতে সব সময় জমা থাকে। ভিজিট দিতে কার্পণ্য করলেই চাঁদার খাতাগুলোও ছুটে আসতো তীর বেগে। সুতরাং এ হেন লোককে অল্প কিছু দিয়ে রেহাই পাবেন বলে মনে হলো না। সারাদিনের অনাহার পূর্ণদার যেন বৃথাই গেল। আর ঘন্টাখানেক দেরী করে আসতে পারলেই কাজ হতো।

কিন্তু তেমন কিছুই হলো না। পূর্ণদাকে দেখতে পেয়েই চৌধুরী মশায় উঠে তাঁর হাত ধরে বল্‌লেন, তুমি একটু বোসো পূর্ণ; তোমার সঙ্গে একটা কনস্যালটেশন আছে আমার। চলো বরঞ্চ ভেতরের ঘরে বসি।

পূর্ণদা মনে মনে একটু খুসী হলেন! কনস্যালটেশন! তা হলে চাঁদার কিছু নয়। নিশ্চয়ই কঠিন কেস হবে একটা! এলোপ্যাথিতে কিছু হয়নি নিশ্চয়ই। তাই হয়ত

হোমিওপ্যাথির একটা চেষ্টা নেবেন। কিন্তু এ তো ডাক্তার রায় চৌধুরীর নূতন ঝোঁক। হোমিওপ্যাথিকের নাম শুনলে আগে তিনি নাক সিঁটকোতেন। বলতেন জল খেয়ে কি হবে! হুঁ, জলের যে কি গুণ তা এলোপ্যাথি কি বুঝবে? বড় বড় কত এলোপ্যাথী ডাক্তার শেষ বয়সে হোমিওপ্যাথির ভক্ত হয়ে পড়েছেন। পূর্ণদার কাছে এখন সব এলোপ্যাথেরই আসতে হবে। এখন তো ছোট খাট ডাক্তার নন! ডাক্তারি রায় সাহেব। পশারও নিশ্চয় বেড়ে যাবে। সবই নামে কাটে তো! চুলগুলোয় পাক্ ধরেছে, সবগুলো একবার সাদা হলেই হয়! হোমিওপ্যাথির পাশপোর্ট যোগাড় হয়ে যাবে।

পূর্ণদা গম্ভীর হয়ে বসে পড়লেন। ডাক্তার রায় চৌধুরীর কনস্থালটেশন সোজা নয়ত!

কিন্তু রায় চৌধুরী মশায় সে ধার দিয়েও গেলেন না। বাইরের দরজাটা বন্ধ। তিনি একটা অর্দ্ধভগ্ন চেয়ারে বসে চিরাভ্যস্ত রাসভারী কণ্ঠে বললেন, কই টেলিগ্রামটা দেখি?

পূর্ণদা একটু শুষ্ক হাসি হেসে আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, আপনিও শুনেছেন বুঝি?

রায় চৌধুরী মশায় এপাশ ওপাশ করে ঘুরে বসে বললেন, সরকারী টেলিগ্রাম বলেই মনে হচ্ছে। নাও হতে পারে। কিন্তু এ কেমন করে হলো?

পূর্ণদা জবাব না দিয়ে ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলেন।

চৌধুরী মশায় নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন

খানিকক্ষণ। তার পর উত্তর না পেয়ে তাঁর হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন, আরে, খুলেই বল না ভায়া। বিশ বছর ধরে সব রকম চেষ্টা করে কিছুই সুবিধা করতে পারছিনে আমি, আর তুমি বিনা চেষ্টাতেই হঠাৎ হয়ে গেলে রায় সাহেব। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারিনে মোটেই। কিন্তু শুনলুম তুমি মুক্ত হস্তে দান করছ, তখন তো আর অবিশ্বাস করতে পারিনে। কেননা চাঁদা দেবার লোক তো তুমি নও! ওষুধের বিলটা পর্য্যন্ত শোধ করোনা তুমি, আর হয়ে গেলে রায় সাহেব! বলো কে আছে তোমার কোথায়? কি করে এটা হ'লো।

পূর্ণদার মাথা দোলানোর গতিটা গেল আর একটু বেড়ে।

রায় চৌধুরী মশায় বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, তোমার মাথা দোলানিটা একটু থামাও পূর্ণ। ব্যাপারটা কি খুলেই বলোনা; আরে, কালেক্টার সাহেবের সঙ্গে তোমার পরিচয়টা যে আমিই করে দিয়েছি। এখন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেয়ে খুব মাথা দোলাতে সুরু করে দিয়েছো। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থেকে সহরের সবগুলো প্রতিষ্ঠান আমার হাতে গড়া বললেই হয়। চাঁদা দিতে দিতে জীবনটা বেরিয়ে গেল আমার, আর রায় সাহেবী জুটে গেল তোমার কপালে! কালেক্টর সাহেবের নাতনীর বিয়ের যোগাড়ে আমায় ছুটতে হয় কল্‌কাতায়, আর ভাঙ্গা সাইকেল নিয়ে ঘুরেই তুমি হয়ে গেলে রায় সাহেব। কি আশ্চর্য্যের কথা বলতো!

পূর্ণদা তেমনি চুপ করে রইলেন।

ডাক্তার রায় চৌধুরী রাগ করে বললেন, অবশ্য তোমার গোপন কথা আমি শুনতে চাইনে, কিন্তু যতই রায় সাহেব হও পূর্ণ আমার কাছে যেতে হবে তোমায়। অসুখ অবশ্য রায় সাহেবকেও খাতির করে না এটা মনে রেখো।

ডাক্তার রায় চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন।

পূর্ণদা ভার গলায় বললেন, বসুন ডাক্তার বাবু, বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না, তাই আমি চুপ করেছিলুম।

রায় চৌধুরী মশায় বসে বললেন, নাও এবার চট্ করে বলে ফেল, বিশ্বাস না করার কি আছে? একি তোমার হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যে বিশ্বাস করবো না। ওসব জলো ওষুধে আমার বিশ্বাস নেই সত্যি! কিন্তু তাই বলে তোমার রায় সাহেব হবার গোপন পথটি অবশ্য অবিশ্বাস করবো না। সত্যি করে বলো দেখি, কার জোরে রায় সাহেবীটা পেলে?

পূর্ণদা একটু আড় চোখে তাকিয়ে বললেন, নক্সভমিকা!

রায় চৌধুরী মশায় আশ্চর্য্য হয়ে ভুরু দুটা কুঁচকে বললেন, নক্সভমিকা? বলো কি?

পূর্ণদা মাথা নেড়ে বললেন, সত্যিই তাই, সবটা তা হলে খুলেই বলি। আপনি আমার হিতকামী বন্ধু! কথাটাও গোপন রাখবেন আশা করি। সুতরাং আপনার কাছে বলতে কোন বাধা নেই! সেই যে সেবার কালেক্টর সাহেবের

নাতনীর অসুখের সময় আমাকে ডাকিয়েছিল, তাতে আমি তোড় জোড় বেধে সব ক'টি ওষুধ নিয়েই কালেক্টর সাহেবের বাংলোয় যাই। দেখি সাহেব ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। আমায় দেখেই বললেন, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে তার নাকি বিশ্বাস নেই মোটেই। তবে কিনা ডাক্তার রায় চৌধুরীর মত অনুসারে আমাকে কল দিয়েছেন তিনি। অবশ্য ঔষধটা যেন ঘন ঘন দেওয়া হয় রোগীকে। একডোজ দিয়ে সাতদিন বসে থাকা তার মোটেই সহ্য হয় না। সাহেবের কথাগুলো শুনে ঘাবড়ে গেলুম আমি। সভয়ে তাঁর নাতনীকে অসুখের কথা জিজ্ঞেস করতেই যে-সব লক্ষণগুলো তিনি বললেন, তাতে দেখলুম হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সব গুলোই তাকে দেওয়া যায়। ওদিকে কালেক্টর সাহেব হম্বি তম্বি সুরু করে দিলেন। কখন যে চাপরাশীকে ডেকে ফেলেন একটা ভয়ই হ'লো। মানে ওমুখো তো হইনি কখনো। শেষকালে কিছু বুঝতে না পেরে দিলুম একডোজ—মানে বুঝলেন কিনা ঐ নক্স!

রায় চৌধুরী মশায় বাধা দিয়ে বললেন, সারলো তাতে? অসুখ কি হয়েছিলো মোটেই বুঝতে পারনি বোধহয়।

পূর্ণদা ঢোক গিলে বললেন, আমাদের শাস্ত্রে আছে, যখন কোন ঔষধ দেবার না থাকে তখন নক্স—

রায় চৌধুরী মশায় বিরক্তিভরে বললেন, শাস্ত্রটা একটু ভাল করে পড়ো পূর্ণ, তা না হলে কোন রোগ ধরতে পারবে

না। ডাক্তারী করবে অথচ ডাক্তারী শিখবে না ; এটা ভাল নয়। মেয়েটার চিকিৎসা আমিই আগে করেছি, আমি জানি তার কি রোগ হয়েছে। ঔষধে আর তার কোন প্রয়োজন ছিল না বলেই তোমাকে ডাকতে হয়েছিল। যাক্ এর সঙ্গে তোমার রায় সাহেবীর কি হলো ?

পূর্ণদা মাথা দুলিয়ে বললেন, সেইটাই তো মজার কথা। পরের দিন ভয়ে ভয়ে ঢুকে দেখি নাতনীর রোগ বেমালুম সেরে গেছে। দিব্যি চায়ের টেবিলে বসে প্রাতরাশ করছেন। আমাকে যত্ন করে চা খাইয়ে দিলেন। কালেক্টর সাহেব কতক্ষণ ধরে হেসে কথা কইলেন আমার সঙ্গে। বলেই ফেললেন প্রকাশ্যে, আমার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। আমার ঔষধ নাকি খুব ভাল কাজ করে। পরে চাপরাশীর কাছে শুনলুম কালেক্টর সাহেবের নাতনীটির মাঝে মাঝে অমন অসুখ হয়। তার পরদিনই সেরে যায়। আমার ঔষধও প্রত্যক্ষ ফল দিয়েছে।

সেই জন্য তো বলি রায় চৌধুরী মশায়, আপনার ডাক্তারখানায় একটা হোমিওপ্যাথিক বিভাগ খুলে দিন। তাতে হয়ত রায় সাহেব হবার সুবিধা হবে।

কালেক্টার সাহেব আবার হোমিওপ্যাথিকের পরম ভক্ত হয়েছেন। তবে নক্সভমিকা একটু বেশী করে রাখবেন। নক্সভমিকা একেবারে একটা জীবন্ত ঔষধ !

রায়চৌধুরী মশায় বলে উঠলেন, হুঁ, সে তো খুব বুঝতেই

পারছি ? তবে ভালরূপে বুঝতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না আমায়। তুমি যতই গোপন করবার চেষ্টা করো ব্যাপারটা আমি জেনেই নেবো। আমি করে এলুম ইন্‌জেক্‌সন একটার পর একটা করে, তাতে কিছু ফল হলো না, আর ফল হলো ঐ তোমার একফোঁটা নস্কভমিকার জলে ? আর তাতে জুটে গেল রায় সাহেবী খেতাব! আর এতেই যদি হতো তাহলে কবে ডাক্তারী ছেড়ে তোমার ঐ নস্কভমিকার শিশি নিয়ে ঘুরে বেড়াতুম। আরে নিমতলা আর কাশীমিত্র ছুটো ঘাটই চিনি আমি, তবে পথটাই যে ভুল হচ্ছে বার বার। নইলে তুমি হও রায় সাহেব আর আমি বেগার খেটে যাই। এসব বড় বড় উপাধির মর্য্যাদা গুলোই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমনি করে। এমনটা হলে রায় সাহেব হবার ইচ্ছাটা ছাড়তে হবে আমাদের।

স্টেথোস্কোপের নলটা হাতে নিয়ে রায় চৌধুরী মশায় এগোতে লাগলেন। পূর্ণদা একটু এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, কাল একটা সভার আয়োজন করা হচ্ছে। আপনাকে দেখতে পাবো নিশ্চয় সেখানে। ওরা একটা সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেছে। নিষেধ করলুম কত, শুনলে না। আবার পাঁচশো টাকা চাঁদাও আদায় করে নিয়ে গিয়েছে আমার কাছ থেকে এজন্য। কী দরকার ছিল এর বলুন তো ?

রায়চৌধুরী মশায় কোন উত্তর দিলেন না।

পূর্ণদা বলেই চললেন, কাল আবার রোগী আছে অনেক-

গুলি। শক্ত কেস ছাড়া আমার কাছে আর আসে না কেউ। আজ সারাদিন তো রোগী দেখতেই কাটলো। কাল রোগী দেখে সময় করে উঠতে পারবো কি না সন্দেহ। অথচ না গিয়েও তো কোন উপায় নেই। আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আবার তাদের পচ্ছন্দ হয় না। আমার ফিয়ের রেট বেশী শুনেও ছাড়েনা। ভাবছি কাল থেকে ভিজিটটা আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। আপনার হাতে ছোটখাট রোগী এলে অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দিলে খুব সুখী হতুম। অবশ্য ছোট কেস আমি বড় দেখতে চাইনে। তবে আপনার দেওয়া কেস স্বতন্ত্র কথা!

রায়চৌধুরী মশায় হেসে বললেন, রায় সাহেব ডাক্তার, ছোট কেস নিলে লোকে বলবে কি?

পূর্ণদা সায় দিয়ে বললেন, সে ঠিক, এখন ছোট কেস খুব হিসেব করে নিতে হবে। কিন্তু বড় কেস যা পাই, তারা পয়সা দিতে চায় না বড়। আপনার রোগীরা নগদ কারবার করে। বাকীর কারবার আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে। রায় সাহেব হয়ে ছোট কেস নিলে লোকেই বা বলবে কি? শেষটায় খেতাব নিয়ে দুকূল না হারিয়ে বসি!

রায়চৌধুরী মশায় গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি একটু ভেবে দেখ পূর্ণ কথাটা ভেঙ্গে বলবে কি না? নক্সভমিকায় রায় সাহেব হয়েছ এ কথাটা না বললেই ভাল হতো?

উত্তরের কোন অপেক্ষা না করে রায়চৌধুরী মশায় হন্‌হন্‌

করে চলে গেলেন। পূর্ণদা বিমর্ষভাবে ডিসপেন্সারী ঘরে ঢুকে পড়লেন।

সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন নির্ম্মলবাবু যা করেছিলেন, তা দেখে পূর্ণদাকে স্বীকার করতে হলো বাহাদুর বটে! অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই বাদ যায় নি। উদ্বোধন সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, ম্যাজিক, মায় বক্তৃতার ব্যবস্থা রয়েছে। রাত্রে নাকি একটা নাটকও অভিনয় করবে নাট্যশালার সভ্যেরা। এ ছাড়া সব চেয়ে লোভনীয় বিষয়টি ছিল সভা শেষে চায়ের মজলিস আর তার রকমারি ব্যবস্থা। সহরের গণ্যমান্য থেকে আরম্ভ করে বহু অখ্যাত লোকও জুটেছে। বড় সাহেব, মেজো সাহেব, ছোট সাহেব এমন কি সত্যিকারের সাহেবরা পর্য্যন্ত এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে। এই সভায় সাহেবদের জন্য চায়ের ভাল ব্যবস্থা, আর মো-সাহেবদের জন্য একটা ছোটখাট ব্যবস্থা ছিল। কোট প্যান্টে সভার প্রায় অর্দ্ধেকটা ভরে গেল। ব্যাপারটা দেখলেই যেন মনে হয় এ যেন ফারপোর বাড়ীতে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভা বসেছে।

পূর্ণদা এলেন জুড়ি গাড়ীতে। চিরাভ্যস্ত ধুতি চাদরের মায়া ত্যাগ করে তিনি এসেছেন সাহেবী বেশে। নূতন কেনা কোট ও প্যাণ্টটি তাকে ভাল করে ফিট্ করেনি। মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে বড় বে-মানান দেখাচ্ছিল। পোষাকের মহিমায়

ভিতরের একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠছিল তাঁর মুখে। রায় সাহেবী বজায় রাখতে হ'লে সুট ছাড়া তো চলবে না। অস্বস্তিকর ভাবটা দূর করবার বিফল প্রয়াসে পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে ঘন ঘন ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা তিনি মুছে ফেলতে লাগলেন। ঘটনার প্রচণ্ডতা দেখে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বন্ধুরা দূরে রইলেন। একটা গর্ব্ব মিশ্রিত ভাবের সঙ্গে করুণা মাখানো দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন পূর্ণদা তাঁদের দিকে, তারপর সাহেবদের দিকে এগিয়ে প্রায় আভূমি প্রণত নমস্কার জানাতে সুরু করে দিলেন সবাইকে। তাঁর সন্ধানী চোখ কালেক্টর সাহেবের প্রত্যাশায় এদিক ওদিক ঘুরতে দেখা গেল, কিন্তু তাঁকে সে সভায় দেখা গেল না।

সভার কাজ সুরু হলো। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় এক অতিদীর্ঘ অভিভাষণে পূর্ণদার কার্য্যাবলী এমনি-ভাবে বলা সুরু করলেন, যার অনেকগুলো পূর্ণদা নিজেই জানতেন না। অবাক্ হয়ে গেলেন তিনি এই ভেবে তাঁর এত গুণাবলী থাকতেও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারীর পশারটা তার জমলো না কিসে।

সভার কাজ মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছতেই এক বড় সাহেব বলে উঠলেন, সভার কাজ এখন বন্ধ রাখতে হ'বে। তাঁদের চায়ের সময় হয়েছে, সুতরাং এখনই উঠতে হবে। সভা-পতির ঘোষণার আগেই সভা ভেঙ্গে গেল। সবাই ব্যস্ত হয়ে চায়ের মজলিসে ছুটলেন। চেয়ার টানাটানির একটা হট্টগোল

সুরু হলো। সভাপতি মশায় পূর্ণদাকে নিয়ে অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই নির্ম্মল বাবু কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে একখানা ছাপানো কাগজ সভাপতির হাতে দিয়ে বললেন, ভীষণ কাণ্ড, এইমাত্র ডাক এসে পৌঁছল—গেজেট এসে গেছে। চায়ের আসরে যাঁরা তখনও চেয়ার পাননি তাঁরা ঝুঁকে পড়লেন সবাইকে ঘিরে। গেজেটটা দেখবার জন্য সকলের একটা বিপুল আগ্রহ। পূর্ণদা নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ছাপা অক্ষরে রায় সাহেবের রাজটিকা দেখবার জন্যে।

নির্ম্মলবাবু রুদ্ধশ্বাসে জানালেন, পূর্ণদার নামটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এতে। অনেকবার দেখেছি আমরা।

ব্যাপার কি! সবাই সভাপতি মশায়কে যেন পিষে ফেলে গেজেটটা দেখে ফেলার ব্যবস্থা করলেন।

অনেক কষ্টে সভাপতি মশায় গেজেট দেখে ঘোষণা করলেন, বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি পূর্ণবাবু, রায় সাহেব হয়েছেন পূরণচাঁদ আগরওয়ালা, অবশ্য আমাদের জেলারই লোক তিনি—।

কিন্তু পূর্ণদাকে সভায় আর দেখা গেল না। নির্ম্মল তাঁর সন্ধানে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলেন পূর্ণদা জুড়িগাড়ী আর চায়ের মায়া ত্যাগ করে হন্ হন্ করে ছুটে

চলেছেন। কিছু দূর গিয়েই তিনি পকেট থেকে কি যেন একটা বের করে রাস্তায় ফেলে দিলেন। নির্ম্মলবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলেন, একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশি। ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে নক্সভমিকা। হাসি আর চেপে রাখতে পারলেন না তিনি।

হাসির শব্দে পূর্ণদা পেছন ফিরে নির্ম্মল বাবুর দিকে কটমট ভাবে চেয়ে যেমন ভাবে চলছিলেন তেমনি চলতে লাগলেন।

বড় ড়েঁপো ছেলে এই অরুণ। লেখা পড়ায় ভাল হলে কি হবে, তার দুষ্টুমির জ্বালায় সবাইকে থাকতে হয় অতিষ্ঠ হয়ে। মুখ ফুটে অবশ্য কেউ তাকে কিছু বল্‌তো না, কেননা বিপদে আপদে অরুণের সাহায্যটা সকলেরই একান্ত দরকার। সহরের সব বাড়ীর অন্দর মহলে তার অবাধগতি। কোন্‌ বাড়ীর কোন্‌ জামাইয়ের পিস্‌তুত ভাইয়ের কত ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আছে, কার ভাগ্নিজামাইয়ের মেজ শালার কবে কি অসুখ হয়েছিল, এসব তথ্য মেয়েদের মুখ থেকে শুনে শুনে তার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছল। সহরে এমন কোন লোক ছিল না যার অন্দর মহল আর তার আত্মীয় স্বজনের সংবাদ সে না রাখ্‌তো। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল এই যে, মাড়োয়ারী মহলের দুর্ভেদ্য অন্দর মহলেও সে অনায়াসে প্রবেশ করে দিব্যি মতিচুরের লাড্ডু আর নানা রকম আচার খেয়ে শেয়ার আর ফাট্‌কার বাজার ইত্যাদির লেনদেন কারবারের নানা কথাও জেনে নিতো। সবাই তাকে সেজন্য বলতো 'ক্ষুদে গেজেট'!

মাঝে মাঝে এর কথা ওর কাছে লাগিয়ে নিজে পরম নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়ে মজা উপভোগ করতো। ব্যাপারটা অবশ্য চাপা থাকতো না শেষ পর্য্যন্ত। খানিকটা তিক্ততার পর মিটে যেতো। মাঝে মাঝে অবশ্য কখনো উঠতো চরমে ;— যেমন সেবার হয়েছিল স্বয়ং কালেক্টার সাহেবের বেলায়। কালেক্টার সাহেব কোন ক্লাবে রাত্রে একটু তরলপানীয় সেবন

করেছিলেন। ব্যাপারটা পরদিনই গেল কালেক্টার গৃহিণীর কানে। ফলে কালেক্টার সাহেবের ক্লাবে যাওয়া বন্ধ হলো। ব্যাপার জানতে পেরে অরুণকে ডেকে ধমকে দিলেন তিনি।

স্কুলের মাষ্টার মশায়রাও তাকে কিছু বলেন না। পড়া-শুনায় সে অদ্বিতীয় বলে তার দুষ্টুমিটাও তাঁরা সহ্য করে চলতেন। স্কুলের ব্লাকবোর্ডে রোজই মাষ্টার মশায়দের উপলক্ষ করে আঁকা থাকতো নানারকম ছবি। সেগুলো এমনি সুন্দর করে আঁকা যে, মাষ্টার মশায়রা মুছে ফেলতেও দ্বিধা বোধ করতেন। স্কুলের পাঠ্য ছাড়া বাইরের বই পড়ার ঝোঁক ছিল তার বেশী। পড়ানোর সময় বেশীর ভাগ সময় সে থাকতো অন্য বই নিয়ে। অথচ পড়া ধরলে তার নির্ভুল উত্তর দিত। ফলে এই ভাল অথচ দুষ্টু ছেলেটাকে সবাই যেন একটু সম্মান করেই চলতেন। কেবল পণ্ডিত মশায়ের কাছে তার দুষ্টুমি চলতো না। কারণে অকারণে তিনি মাঝে মাঝে কষে কান মলে দিতেন তার।

পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী স্কুলের কাছে। এই অহেতুক আক্রমণটা তার পছন্দ হতো না। পণ্ডিত মশায়কে কি করে হেস্তনেস্ত করা যায় অথচ তার গায়ে একটুও আঁচড় লাগেনা এরই একটা ফন্দি বের করবার চেষ্টায় সব সময় সে লেগে থাকতো। অরুণদের বাড়ীতে আবার পণ্ডিত মশায়ের আনাগোনা বেশী। তার মা থেকে দিদিমা পর্য্যন্ত

সবাই তাঁকে বিশেষ মান্য করে চলতেন; কাজেই সহসা কিছু করা চলেনা।

সেদিনকার ব্যাপারে অরুণের খুব রাগ হয়ে গেল। পণ্ডিত মশায় ক্লাসে এসেই জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপাদিত ব্যাখ্যা করতে। অরুণ শুনেছিল বাপ্পাদিত্য, কাজেই সে ইতিহাস সুরু করতেই পণ্ডিত মশায় মনে করলেন জেনে শুনেই অরুণ ঠাট্টা করছে। ফলে তার কান দুটো এমন লাল হয়ে উঠল যে, স্কুলের ছুটীর পরও তা মিলিয়ে গেল না। বরঞ্চ ক্লাসের ছেলেরা বাপ্পাদিত্য বাপ্পাদিত্য বলে তাকে উপহাস করতে লাগল। অরুণ ভেবে ঠিক করল পণ্ডিত মশায়কে যে করেই হোক জব্দ করা চাই।

স্কুলের কাছেই পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সকালে তিনি একটা টোলেও পড়ান। টোলের ছাত্রেরা এসে সংস্কৃত শিখে যায় তাঁর কাছে। দুজন ছাত্র আবার পণ্ডিত মশায়ের বাড়ীতেই থাকে।

পণ্ডিত মশায়ের বাড়ীর প্রাঙ্গণে রয়েছে একটা নারিকেলি কুলের গাছ। যা নারকেলি কুল ধরেছে এবার! গাছ যেন ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম করছে। কুলগুলো খুব মিষ্টি। পণ্ডিত মশায় সব সময় কুলগুলো চোখে চোখে রাখেন। স্কুলের পাশে কুলগাছ বলে সব সময়ই সতর্ক দৃষ্টি থাকে গাছটার উপর। দিব্যি পেকেছে কুলগুলো। নেবার উপায় তো নেই, একটা কুল কেউ পেড়েছে ত রক্ষা নেই। সটান যাবেন

পণ্ডিত মশায় হেড মাষ্টার মশায়ের কাছে। আর হেড মাষ্টার মশায়ও হয়েছেন যেমন, কুল গাছে একবার হাত দেবার কথা জানতে পারলেই হয়। একেবারে আস্ত বেত ভাঙ্গবেন পিঠের উপর।

অরুণ ঠিক করলে কুলগুলো তাকে পেড়ে আনতেই হবে, —যতটা সম্ভব। তারপর নিজে না খেলেই হলো। স্কুলের ছাত্রদের জন্য ঘরে ঘরে সে লুকিয়ে রেখে দিয়ে আসবে। স্কুলের জানলাগুলো তো খোলাই থাকে। কিন্তু কুল তো দিনের বেলায় নেওয়া যাবে না। সন্ধ্যার সময় সে বাজারের ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

টোলের ছাত্র দুটি বাইরের ঘরে তার-স্বরে সংস্কৃত পড়া জুড়ে দিয়েছে। পণ্ডিত মশায় সান্ধ্যকৃত্য নিয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগে সে চট্‌পট কুলগাছে উঠে পড়ল। সহসা এদিকে কেউ আসবে একথা অরুণ ভাবতে পারলো না। কাজেই আব্‌ছা অন্ধকারে ভাল ভাল কুলগুলো তুলে ব্যাগে পুরে ফেলতে লাগল। ব্যাগ প্রায় ভর্ত্তি হয়ে এসেছে, এমনি সময় পণ্ডিত মশায়ের প্রাঙ্গণে এসে কে যেন ডেকে উঠলেন, পণ্ডিত মশায় বাড়ী আছেন ?

সর্ব্বনাশ! পণ্ডিত মশায় বেরিয়ে এলে নিশ্চয় কুলগাছ একবার দেখে নেবেন। তখন তো পালাবার আর কোন উপায় থাকবে না। ব্যাগটা হাতে নিয়ে অতি সন্তর্পণে সে নামতে লাগল। ভয়ে ভয়ে নামতে গিয়ে হঠাৎ তার হাতে

একটা কাঁটা ফুটে গেল। অসতর্ক ভাবে সে বলে উঠল উঃ! সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণ থেকে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, কুলগাছে কে ?

অরুণ ভয় পেয়ে গেল। গলা শুনেই বুঝলে যে, এ তাদের স্কুলের সেক্রেটারীর গলা। বড় জাঁদরেল লোক তিনি। ধরা পড়লে নিজেই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। গাছে থাকা আর সমীচীন নয়। আবার বাইরের ঘর থেকে ছাত্র দুটোও লাঠি নিয়ে বের হয়ে আসছে। যে গুণ্ডার মতো চেহারা ছাত্র দুটির। একবার পেছু লাগলে নিষ্কৃতির উপায় থাকবে না। অরুণ তাড়াতাড়ি নামতে লাগল গাছ থেকে।

তাড়াতাড়ি কোন কাজ করতে গেলে অন্যমনস্কতার সুযোগে প্রতি পদে বাধা এসে কাজটাকে আরও বিলম্বিত করে দেয়। নামতে গিয়ে অরুণের সারা গায়ে, হাতে পায়ে কাঁটা ফুটে। ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় ব্যাগ নিয়ে অরুণ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল। ততক্ষণে পণ্ডিত মশায়ও সান্ধ্যকৃত্য ফেলে বাইরে এসেছেন। "ধর ধর" এমনি একটা হট্টগোলের সাড়া পেয়ে অরুণ ছুটল, কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারলো না সে। লাফ দিয়ে পার হবার সময় সে হোচট খেয়ে ব্যাগশুদ্ধ পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টোলের ছাত্র দুটো যমদূতের মতো চেপে পড়লো তার উপর। তারপর বামাল শূন্যে তুলে নিয়ে এলো তাকে পণ্ডিত মশায়ের কাছে।

পণ্ডিত মশায় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়েই ছিলেন। অরুণকে

দেখে তাঁর রাগ গেল আরো বেড়ে। স্কুলের সেক্রেটারী না থাকলে তখনি তিনি প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দিতেন সন্দেহ নেই।

ঘনঘন নস্য নিয়ে বারবার তিনি সেক্রেটারী মশায়কে এই বোঝাতে স্থুরু করে দিলেন যে, এরকম দুর্দ্দান্ত ছেলে নাকি ভূভারতে হয় না। এযে তাঁকে খুন করে বসেনি এইটেই নাকি তাঁর পৈত্রিক আশীর্ব্বাদের পুণ্যফলে ঘটেছে। এখন এর একটা বিহিত ব্যবস্থা না করলে স্কুলে চাকরী করাই তাঁর দায় হবে। হেডমাষ্টার মশায় হয়েছেন আবার এক-চোখো। পরীক্ষায় ভাল ফল করে বলে এই ডাকাত ছেলেটিকে তিনি শাস্তি দিতে চান না মোটেই। যে রকম দুর্দ্দান্ত ছেলে, পরীক্ষায় চুপি চুপি নিশ্চয় নকল করে। তাছাড়া একে তো কোন দিন পড়তে দেখেননি তিনি। অথচ পড়াশুনা না করে পরীক্ষায় ভাল ফল করার মানে যে কি, তা তো সহজেই বোঝা যায়। হেড মাষ্টার মশায় কিন্তু একথা কানেই নিতে চান না।

অরুণকে নিয়ে সেক্রেটারী মশায় একই প্রশ্ন নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করতে লাগলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। অরুণ তার উত্তর এমনি ভাবে দিল যে, তার উত্তর হাঁ বা না দুটোই হতে পারে। ফলে সেক্রেটারী মশায় আরো চটে গেলেন তার উপর; কিন্তু মনে মনে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তারিফ করতেও ভুললেন না। অবশেষে তিনি পণ্ডিত মশায়কে বললেন, এর একটা বিহিত আমরা কমিটি থেকেই করবো পণ্ডিত মশায়।

অরুণ বিনীতভাবে বললে, আমার শাস্তির ভার হেড মাষ্টার মশায়ের উপরই ছেড়ে দিন স্যার !

সেক্রেটারী ধমক দিয়ে বললেন, তুমি থাম ফাজিল ছোকরা। সোমবারে কমিটির মিটিং বসবে। সেদিন তোমার এই দুষ্টুমির ব্যবস্থা হবে।

পরের দিন ভোর হতে-না-হতেই পণ্ডিত মশায় এসে উপস্থিত হলেন অরুণের বাবার কাছে। সালঙ্কারে ঘটনাটা এমনি ভাবে জানালেন তাঁর কাছে, যেন অরুণ সদ্য খুন করে এসেছে,—সোমবার তাই ফাঁসির দিন ধার্য্য হয়েছে। কমিটির বিচার যে ভয়ানক জিনিষ! কত মাষ্টারের চাকরী যায় সে বিচারে, আর অরুণের মত ছোট ছেলে তো তুচ্ছ! হয়তো তিন বছরের জন্য "রাস টিকিটও" হতে পারে। তাহলে পড়াশোনা একদম বন্ধ। হবে না, যেমন ডানপিটে ছেলে!

অরুণের বাবা পণ্ডিত মশায়ের অনর্গল বক্তৃতা অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরে শুনলেন। তারপর তাকে ঘরের মধ্যে পুরে বন্ধ করে রেখে দিলেন। পণ্ডিত মশায় খুসী হয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে অরুণের ক্রমশঃ রাগ হতে লাগল। দোষ করেছে সে, তার জন্য সে শাস্তি পাবে। তাতে সে কুণ্ঠিত নয়; কিন্তু এমন ভাবে শাস্তি সে কোনদিনই পায় নি। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল পণ্ডিত মশায়ের উপর। একবার

ছাড়া পেলেই হয়! এবার আর কুলগাছে একটা কুলও রাখবে না সে।

অরুণের দিদিমা এসে তালাচাবি খুলে অরুণকে বের করে নিয়ে এলেন, তারপর তিরস্কারের সুরে বললেন, কেন তুই এ কাজ করলি বলতো! অরুণ কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, দোষ করেছি দিদিমা, তারজন্য শাস্তি হোক্ দুঃখ নেই। কিন্তু পণ্ডিত মশায় কেন আমাকে আমি যা নয় তাই বলে গালাগাল দিয়ে গেলেন। তুমি দেখো দিদিমা, যত দুষ্টুই হইনা আমি, বড় হলে খুব ভালই হব।

দিদিমা তাকে কোলে তুলে নিলেন, তা আমি জানি অরুণ। বড় হয়ে তুই খুব নামজাদা লোক হবি, সেজন্যই তো তোর সব উপদ্রব সহ্য করে চলি। কিন্তু সময় সময় তোর ডেঁপোমি এত বেশী হয় যে, বিরক্তির একশেষ হয়।

অরুণের মা এই সময়ে এসে বললেন, দিদিমার আদর পেয়েই তো অরুণ এত দুষ্টু হয়ে বসেছে। শেষকালে কি না চোর হয়ে বসলো!

অরুণ একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, চুরি করতে আমি চাইনি মা, পণ্ডিত মশায় একটা কুল কাকেও খেতে দেবেন না, তাই ভেবেছিলুম কুলগুলো পেড়ে ক্লাসে রেখে আসবো। সব ছেলে স্কুলে এসে মজা করে খাবে। দোষ করেছিলুম বটে তার শাস্তি তো পেয়েছি। দোষে গুণেই তো মানুষ।

অরুণের মা বললেন, তা বলে তোমার মত ডেঁপো কেউ হয় না। দিনরাত জ্বালিয়ে খেলে। চারদিক থেকে নিন্দে করলে কাহাতক সহ্য করা যায় বল।

অরুণ হেসে বললে, আবার সেবার যখন স্কুল স্পোর্টসএ প্রায় সবগুলো প্রাইজ পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়ে ফিরে এলুম, তখন কি তোমার বিরক্ত লেগেছিল মা? যত দুষ্টু আর ডোপোই হই না কেন, পড়া শুনায় ক্লাসে কখনো দ্বিতীয় হবো না। লোকের অন্যায় আমি সহ্য করতে পারিনে, তাই দুষ্টু হয়ে যাই। কিন্তু বাবা আমায় আজ এমন মার দিয়েছেন যে, ব্যথায় গা টন্ টন্ করছে। বাবা আজ সত্যিই রেগে গেছেন। আমি আজ কিছু খাবো না। সারাদিন ঘরে শুয়ে থাকবো।

অরুণ উঠে ঘরের ভিতর চলে গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে দিদিমা অনেক সাধ্য-সাধনা করে অরুণকে নিয়ে এসে খেতে দিলেন। অরুণ বই কেনার জন্য দিদিমার কাছ থেকে দশটাকা আদায় করলে সেদিন। মাঝে মাঝে এমনি ভাবে দিদিমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে অরুণ বই কিনতো। বই কেনার ব্যাপারে হেডমাষ্টার মশায় তাকে বলে দিতেন, কি বই তাঁর পড়া দরকার।

পরের দিন স্কুলে যেতেই হেডমাষ্টার মশায় তাকে ডেকে পাঠালেন। অরুণের বুক দুর দুর করতে লাগল। বড় কঠিন এই হেড মাষ্টার মশায়। সহসা তিনি কিছু বলেন না।

কিন্তু একবার যদি রেগে উঠেন তবে আর রক্ষা নাই তাঁর কাছে। অত্যন্ত নির্ম্মম হয়ে শাসনের ব্যবস্থা করেন। সমস্ত স্কুল শুদ্ধ ছেলেরা তাঁকে অত্যন্ত ভয় করে চলতো। অথচ কায়িক শাসন তিনি কদাচিৎ দিয়ে থাকেন। মাষ্টার মশায়রা পর্য্যন্ত তাঁর ভয়ে তটস্থ।

হেড মাষ্টার মশায়ের ঘরে ঢুকতেই তিনি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করলেন তাকে। স্কুল থেকে হেড মাষ্টার মশায় এই সব বই পড়তে দিয়েছিলেন তাকে ক'দিন আগে। অরুণ নির্ভুল ভাবে প্রশ্নের উত্তরগুলি দিতে লাগল। হেড মাষ্টার মশায় খুসী হয়ে একটা কাগজে কয়েকখানি বইএর নাম লিখে দিয়ে বললেন, লাইব্রেরী থেকে এই বইগুলো নিয়ে গিয়ে পড়, যেসব জায়গা বুঝতে পারবে না, আমার কাছে জেনে নিও।

অরুণ কাগজখানা নিয়ে বেরিয়ে যেতেই হেড মাষ্টার মশায় ডেকে বললেন, সেদিন তুমি একটা অন্যায় ব্যাপার করেছ অরুণ। অন্যায়ের একটা সীমা রেখা আছে, তার বাইরে যাওয়া সমীচীন নয়, আশাকরি তুমি নিজেই এটা বুঝতে শিখেছ। তোমার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু আশা করি।

অরুণ মাথা নত করে বললে, তার জন্য আমার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে স্যার। কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়ে আরও অন্যায় করে

বসি। কেউ আমার ভাল উদ্দেশ্যটুকু ধরতে পারে না, এই দুঃখ।

হেড মাষ্টার মশায় মাথা দুলিয়ে একটু হাসলেন। অরুণের মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। একটা নমস্কার করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সোমবার কমিটির মিটিং বসলো। কমিটির অনেকেই অরুণের উপর চটা ছিলেন। কাজেই হেড মাষ্টার মশায়ের অনেক আপত্তি সত্ত্বেও তারা অরুণকে পাঁচটাকা জরিমানা করবার সুপারিশ করলেন। কথা হলো হেড মাষ্টার মশায় নিজেই সে জরিমানার বন্দোবস্ত করবেন, আর হেড মাষ্টার মশায় যদি তার ব্যবস্থা না করেন তবে কমিটি থেকেই একটা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'বে এই ছেলেটির বিরুদ্ধে। প্রয়োজন হলে তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়েও দেওয়া হবে। এমন ডেঁপো ছেলেকে স্কুলে রাখা যায় না। হেড মাষ্টার মশায়ের সব যুক্তি কমিটির সভ্যদের প্রবল প্রতিবাদে ভেসে গেল।

জরিমানার নোটিশটা ক্লাসে জানিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য হয়ে অরুণ বলে উঠল, বাঃ দোষ করলুম আমি, আর জরিমানা দিতে হলো বাবার! আমি কি রোজগার করি যে জরিমানা দেব?

ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা হাসাহাসি করে বলতে লাগল, ঠিক হয়েছে। পড়ায় ভাল ছেলে বলে দুষ্টুমিতেও বড় হবার

সাধ! পণ্ডিত মশায় সোজা লোক নন! কমিটির সব মেম্বররা তাঁর হাতের লোক। ঠিক হয়েছে।

অরুণ কারও কথার জবাব দিল না। স্কুলের ছুটির পর সে বাড়ী গেল না। বিকেলে মাঠে খেলতেও এলো না। নদীর ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে ভাবতে লাগলো। পরের দিনই বেতন দেবার তারিখ। জরিমানা শুদ্ধ বেতন জমা না দিলে নাম কাটা যাবে। জরিমানা মাফ করাবার কোন উপায় নেই। হেড মাষ্টার মশায় তার জন্য যথাসাধ্য করেছেন। তাঁর কাছে যাওয়াও সমীচীন হবে না, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবার আগেই সে বাড়ী ফিরে এলো।

পরের দিন অফিস যাবার পথে অরুণের বাবা স্কুলে ফি জমা দিতে এসেই শুনতে পেলেন, ফাইনের টাকা অরুণ নিজেই জমা দিয়ে গেছে। হেড মাষ্টার মশায়ের আদেশে ফি না নিয়েই ফাইনের টাকা জমা করে নিয়েছেন কেরানী বাবু। এখন শুধু ফিয়ের টাকা দিতে হবে।

অরুণের বাবা অবাক্ হয়ে গেলেন। অরুণ টাকা পেলে কোথায়। টাকা কোন মতে একবার তার হাতে গেলেই বই কিনে বসে। বই কিনে পড়তে সে এত ভালবাসে যে, দামী জামা না নিয়ে বাড়তি টাকায় বই কেনে। সম্ভবতঃ বই কেনার টাকা তার কাছে ছিল, তা থেকেই ফাইন দিয়ে থাকবে। কিন্তু সেটা যে বড় মর্ম্মান্তিক হবে তার কাছে, তা ভেবে তিনি মনে বড় আঘাত পেলেন। আবার এই ভেবে

একটু আশ্বস্ত হলেন যে, যদি এতে তার দুষ্টুমির ভাবটা কমে যায়।

পাশের বাড়ীর একটি ছেলে তাঁকে জানাল, অরুণ তার দিদিমার কাছ থেকে দশটি টাকা পেয়েছিল বই কেনবার জন্য, তা থেকেই ফাইনের টাকাটা দিয়েছে।

ঠিক তাই। অনেকদিন থেকে অরুণ "ডিস্কভারী অফ ইণ্ডিয়া" বইখানি কেনবার জন্য তাঁর কাছে বায়না ধরেছিল। কিন্তু এতটুকু ছেলে ঐ বই পড়ে কি বুঝবে ভেবে তিনি বইটা কিনে দেননি। পাড়ার এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে বইটা সে পড়ে আসতো, বুঝতো কি না জেনে নেবার সময় পর্য্যন্ত তিনি পাননি। যাক অরুণের সুমতি ফিরে এলে তিনি কিনে দেবেন বইটা। ফিয়ের রসিদটা হাতে করে স্কুল থেকে তিনি বের হয়ে এলেন।

বিকেল বেলায় অরুণকে আর খেলার মাঠে দেখা গেল না। অরুণ ছিল ভাল খেলোয়াড়। তার অভাবে খেলাটাও ভাল ভাবে জমলো না। কোন রকমে খেলা শেষ করে হকি ষ্টিক হাতে করে ছেলের দল বাড়ী ফিরে গেল।

অরুণ তখন ঘুরছিল স্কুল কমিটির সভ্যদের বাড়ীতে। যদি কোনমতে ফাইনটা মাপ করে নেওয়া যায়। সবাই বিরক্তি-ভরে তার সঙ্গে এমনিভাবে ব্যবহার করলেন যে, সে বুঝলে জরিমানা মাপ করা তো দূরের কথা, ভবিষ্যতে আরও শাস্তির বিধান তার জন্য তোলা রয়েছে। অনেকে আবার তার সঙ্গে

দেখাটি পর্য্যন্ত করলেন না। অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হয়ে অরুণ ফিরে এলো বাড়ীতে।

পরের দিন ছিল স্কুলের ছুটী। অরুণ ঠিক করলে, পণ্ডিত মশাইকে সে ভাল করে ধরবে। পণ্ডিত মশায় যদি কমিটির সভ্যদের অনুরোধ করেন, তাহলে সে হয়তো জরিমানার টাকাটা ফেরৎ পেতে পারে। কায়িক শাস্তি নিতে সে ভয় পায় না। কিন্তু জরিমানা তাকে দিতে হয়েছে এই প্রথম। তাই এই ব্যাপারটা মর্ম্মান্তিক হয়ে লেগেছে তার মনে।

পণ্ডিত মশায় বাড়ী ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বিদ্রূপ করে বললেন, কেমন আর কুল চুরি করবে? দাও এবার জরিমানা। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

অরুণ অনুনয় বিনয় করে জানালে, যেমন করেই হোক পণ্ডিত মশায়কে বলে কয়ে জরিমানাটা মাফ করাবার ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে। কমিটির মেম্বারদের একটু বলে দিলেই এটা সম্ভব হতে পারে।

পণ্ডিত গৃহিণী মাথা নেড়ে বললেন, সে আমি পারবো না বাপু, তোমার মত বাচাল ছেলের শাস্তি হওয়াই দরকার। আর তা ছাড়া উনি এখন খুব ব্যস্ত। মেয়ের বিয়ের পণের টাকা জোগাড় করতে হবে তাঁর। কোলকাতায় ভাল ঘরে সম্বন্ধ হচ্ছে। মহেশবাবুর ছেলের সঙ্গে। মহেশবাবুর নাম শোন নি। কোলকাতায় বড় দোতালা বাড়ী তাঁর।

অনেক টাকা ! তাই পণের টাকা কিছু কম করে নেবার জন্য একখানা চিঠি লিখে পোষ্টাফিসে দিতে গেছেন। ফিরে এলে তুমি নিজে বলো, আমি পারবো না বাপু। তোমার নাম শুনলেই চটে আগুন ! বলেও কিছু লাভ হবে না।

অরুণ স্তব্ধ হয়ে বেরিয়ে এলো। পথেই পড়লো সুন্দরমল আগরওয়ালার বাড়ী। মস্ত বড় তেতালা বাড়ী। ঘরে ঘরে চটের পর্দ্দা ঝুলছে। বাইরের দরজাতেও পর্দ্দা। তা ঠেলে অরুণ ভেতরে ঢুকে পড়লো। সুন্দরমল কমিটির এক উৎসাহী সভ্য। স্কুল বিলডিং কণ্ট্রাক্ট উনিই নিয়েছিলেন। পনের হাজার টাকা খরচ করে চল্লিশ হাজার টাকার বিল দাখিল করেছিলেন, পরে কমিটির অনুরোধে দশ হাজার টাকা বিল থেকে ছেড়ে দিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র নেন। এখনও এই বদান্যতার জন্য মার্ব্বেল পাথরে খোদা 'সুন্দরমল বিজ্ঞানাগার' তাদের স্কুলেরই একটা অংশ।

কমিটির অন্যান্য সভ্যেরা এঁর কথায় উঠা-বসা করেন। গতকাল এঁর কাছে এসে বিশেষ সুবিধা হয় নি। পড়াশুনা করাটা মূর্খতার পরিচায়ক, এই কথাটা বারবার জানিয়ে তিনি ফাটকার বাজারের হিসেবে মন দিয়েছিলেন।

কয়েকটা মতিচুরের লাড়ু আর আচার খেয়ে অরুণ তার সুপারিশ জানালো অন্দর মহলে। মাড়োয়ারী গৃহিণী তাকে স্নেহ করতেন। একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে দিয়ে বলে উঠলেন, "কি হয়েসে অরুণ, তুমি এই টাকা নিয়ে যাও,

ইস্কুলে জমা দাও। বাস্, এর জন্য আর সব লোগ্‌কে বলতে হোবে কেন ?"

অরুণ মাথা নেড়ে বললে, তা হয় না। জরিমানার টাকা সে জমা দিয়েছে নিজেই। জরিমানার খাতা থেকে তার নাম কাটানোই দরকার। সেইজন্য আগরওয়ালাজীকে বলা দরকার।

মাড়োয়ারী গৃহিণী মাথা নেড়ে বললেন, সে কি করে হোবে। এখন তো বলা যাবে না। ফাটকার বাজার পড়তির সময় এখন। উঠতির সময় সব মাল বেচে দিলে লাভ হবে। তারাচাঁদ কোলকাতাসে তার করবে তিন রোজ বাদ। ভালা খবর মিলনেসে আগরওয়ালাজী, কোলকাতা রওনা হবে, মাল বিলকুল বেচবে। তব হবে। দশরোজ বাদ তুম্ আও।

অরুণ একটা নমস্কার করে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

পাশ দিয়ে একটা মোটর যাচ্ছিল। অরুণকে দেখে মোটরটা হঠাৎ থেমে গেল। দরজা খুলে খানবাহাদুর সাহেব বেরিয়ে এসে বললেন, আবার কোথায় চলেছো তুমি ?

অরুণ মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। বড় কড়ালোক এই খানবাহাদুর সাহেব। হাতের ছড়িটার দিকে একবার চাইলো সে। হঠাৎ পিঠে না পড়লে হয়। অরুণকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠলেন তিনি, ডেঁপো ছোকরা ফাইন দিয়েও তোমার জ্ঞান হয় নি দেখছি। কাল

একবার এসে জ্বালাতন করে গেছ, আজও রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ সকাল বেলায়। পড়াশুনা নেই বুঝি।

অরুণ বিনীতভাবে বললে, আজকের পড়া কাল রাত্রেই করেছি।

খানবাহাদুর সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, সেই বলে সময় নষ্ট করতে হবে বুঝি,—চোর হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে রাস্তায় রাস্তায়? হেড মাষ্টার মশায় এখনি উঠে গেলেন আমার বাসা থেকে। তোমার রচনাটাই নাকি ভাল হয়েছে সব চেয়ে, আমার দেওয়া প্রাইজের পঞ্চাশ টাকা তোমাকেই দেবার সুপারিশ করলেন তিনি। তোমার মত ডেঁপো ছেলেকে সে প্রাইজ দেবো না আমি। নিজেকে সংশোধন কর আগে, তারপর বিবেচনা করা যাবে। যাও, বাড়ী গিয়ে পড়াশুনা করগে।

মোটর হাঁকিয়ে তিনি আবার চলে গেলেন। অরুণ অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলতে লাগলো। কিছুদূর এগোতেই কে যেন ডাকলো, অরুণ ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলে খান বাহাদুর সাহেবের মেয়ে আমিনা তাকে ডাকছে। আমিনা বি, এ পড়ে। অরুণ কাছে যেতেই সোল্লাসে বলে উঠলো, অরুণ বিলেতে ছেলেদের কাগজে যে লেখাটা তুমি পাঠিয়েছিলে, তা' ছাপিয়েছে তারা। আমাদের অধ্যক্ষ খুব প্রশংসা করছিলেন তোমার।

অরুণের বুক আনন্দে ফুলে উঠল। বিলেতের কাগজে

তার লেখা বেরিয়েছে, কোনোদিন সে এ কল্পনাও করেনি।

—আমায় দেখাবে দিদিভাই?

আমিনা মাথা নেড়ে বললে, সে তো এখুনি তোমাদের হেড মাষ্টার মশায় নিয়ে গেলেন আব্বাজানের কাছ থেকে। স্কুলে গেলেই দেখতে পাবে। তোমার আব্বাকে নাকি দেখাবেন সেটা। চা খাবে, অরুণ।

অরুণ বললে, না দিদিভাই। খানবাহাদুর সাহেব সকাল বেলা ঘুরতে দেখে মোটর থামিয়ে খুব বকে গেছেন। আবার এসে যদি চা খেতে দেখতে পান, তাহলে কমিটি থেকে আরো পাঁচ টাকা ফাইন করে দেবেন। আচ্ছা দিদিভাই, তুমি বলে-কয়ে জরিমানাটা মাপ করিয়ে দিতে পার না।

আমিনা একটু হেসে বললে, কি জানি অরুণ, আব্বা তোমার নাম শুনলেই চটে উঠেন। রোজই বলেন, এমন চমৎকার ছেলে কেবল ডেঁপোমি করে বেড়ায়। একটা কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার। আব্বার প্রাইজটা তুমিই পাবে। হেড মাষ্টার মশায়কে বলে দিলেন প্রাইজটা এখন বন্ধ রাখতে। তোমার দুষ্টুমিটা একটু কমলেই নাকি প্রাইজ দেওয়া হবে। আব্বা এখন খুব ব্যস্ত কি না। জব্বার ভাই তিন চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে বিলেত থেকে। কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম পেলেই রওনা হবেন তিনি। কয়েকদিন যাক্, জব্বার ভাই আসুক, তারপর বলবো তোমার কথা।

অরুণ খুসী মনে বের হলো সেখান থেকে। একটু এগিয়েই কালেক্টার সাহেবের বাংলো ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। অরুণ সোজা গেটের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দারোয়ান সেলাম দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মেমসাহেবের স্নেহের পাত্র সে। অবাধগতি তার এখানে। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে সে, সাহেব আছেন কি না। দারোয়ান সেলাম জানিয়ে বললে, না হুজুর সাহেব মফঃস্বল গেছেন, আজই ফিরে আসবেন জরুর।

চকোলেট, বিস্কুট, টোষ্ট, জেলী মাখন ইত্যাদি অনেক জুটলো সেখানে অরুণের। কালেক্টার গৃহিণী কুল চুরির জন্য নানারকম তিরস্কার করলেন তাকে। অরুণ সব শুনে গেল চুপ করে। তারপর দিব্যি পেট ভর্ত্তি করে বললে, যাই হোক্ জরিমানার টাকাটা তাঁকে মাপ করিয়ে দিতেই হবে। জেলার কর্ত্তা তিনি, একটু বলে দিলেই হয়।

কালেক্টার গৃহিণী দৃঢ়ভাবে বললেন, কিন্তু তুমিও তো জঘন্য দোষ করেছ অরুণ, তার জন্য কঠিন শাস্তি পাওয়া দরকার।

অরুণ মাথা নত করে বললে, তার জন্য আরও দু'ঘা বেত নিতে তার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু জরিমানা থেকে রেহাই দিতে হবে তাকে।

"সে কি করে হবে! দুষ্টুমী করলে তার শাস্তি পেতেই হয়, সুতরাং এ আমি বলতে পারব না।"

অরুণ একটু হেসে বললে, কিন্তু জগতে যাঁরা বড় হয়েছে, তাঁদের ছোট বেলার ইতিহাস খুঁজলে দেখতে পাবেন, তাঁদের

সবাই কিছু কিছু দুষ্টু ছিলেন। অবশ্য আমার মত কুল চুরি করেন নি কেউ। কিন্তু যা করেছেন, কুল চুরির চাইতে কম নয়। আমি কোনদিন বড় হতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু নির্জ্জলা ভাল কি নির্জ্জলা মন্দ হবো না, এটা ঠিক। আপনি নিজে একবার অন্য বাড়ী থেকে আচার চুরি করে খেয়েছিলেন সে তো আপনি নিজেই বলেছিলেন আমার কাছে। অথচ এদেশে এম-এ পরীক্ষাতে প্রথম হয়ে বিলাতী ডিগ্রী পেতেও আপনার বাধেনি। ছোট বেলায় আপনি কি কম দুষ্টু ছিলেন, মনে করে দেখুন তো।

কালেক্টার গৃহিণী হাসতে লাগলেন। পরে হাসি থামিয়ে বললেন, সেজন্যই তো দুষ্টুমি আর সহ্য করতে পারিনে। যাক্ তোমার সাহেব এখন খুব ব্যস্ত। কলকাতায় বালীগঞ্জে আমাদের একটা বাড়ী কেনার কথা হচ্ছে, বাড়ীটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। একজনের চার আনা অংশ রয়েছে, সেই কেবল রাজী হচ্ছে না। আজকালের মধ্যেই টেলিগ্রাম এসে পড়বে। তখন এখান থেকে রওনা হবেন সাহেব। এখান থেকে যদুবাবু, অতুলবাবু, যোগেনবাবু এই তিন উকিল যাবেন তাঁর সঙ্গে। এঁরাও আবার তোমাদের স্কুলের মেম্বার। সব ফিরে আসুন, তারপর তোমার ব্যবস্থা হবে।

তিনি উঠে একখানা কাগজ এনে দিয়ে বললেন, তোমার লেখাটা বেরিয়েছে এই কাগজে। সাহেব খুব প্রশংসা করেছেন লেখাটা পড়ে। তোমার পরের লেখাও ছাপা হবে

জানিয়েছে। সম্পাদক দু'পাউণ্ডের চেক পাঠিয়েছেন লিখেছেন। চেকটা এলে নিয়ে যেও।

বিলেতের পত্রিকার লেখা এঁরই উৎসাহে সে পাঠিয়েছে। স্কুলের দেরী হবে জানিয়ে সে উঠে পড়ল।

রায় বাহাদুর গৃহিণী রিক্সা করে বাড়ী ফিরছিলেন। অরুণকে পথে দেখতে পেয়েই রিক্সা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি অরুণ, তুমি নাকি কুল চুরি করা অভ্যাস করছো এখন, শেষকালে এতদূর অধঃপাতে গেলে।

অরুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, পণ্ডিত মশায়ের উপর খুব রাগ হয়েছিল তাই। পণ্ডিত মশায় এমনি ভাবে কান মলে দিয়েছিলেন যে, কানটা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম করছিল। তাই ভেবেছিলুম, তাঁর গাছের কুলগুলো ছিঁড়ে বিলিয়ে দেবো। দিনের বেলায় সেটা—

রায় বাহাদুর গৃহিণী হেসে বললেন, তাই বল, এদিকে তোমাদের রায় বাহাদুর তো তোমার উপর আগুন! বললেন সেদিন, অরুণটা চোর হয়েছে আজকাল। কঠিন শাস্তি দেওয়া দরকার তাকে। পণ্ডিত মশায় সেদিন তোমার সম্বন্ধে অনেক নালিশ করে গেছেন কি না, তাই। তারপর ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কমলা বের করে নিয়ে বললেন, "নাও এটা খেতে খেতে বাড়ী চলে যাও।" অরুণ একটু আমতা আমতা করতে বললেন, "ফাইন হয়েছে না কি? তা আর কি করে মাপ হয়! আর সে-সবের সময়ই বা কখন।

তোমাদের রায় বাহাদুর যে ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন কলকাতায়। খুব বড় ঘরের সম্বন্ধ কি না? কথাবার্ত্তা প্রায় ঠিকঠাক। ছেলেটি একটু বেঁকে বসেছে। এখন বিয়ে করতে চায় না। অশোকের মত পেলে এই মাসেই বিয়ে হবে। তোমায় কিন্তু বরযাত্র যেতে হবে, ভুল না যেন। তোমাদের স্কুলের মেম্বার বিনয় ডাক্তার, মহেশ ভাদুড়ী, যদুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে অশোকের টেলিগ্রাম পেলেই তোমাদের রায় বাহাদুর রওনা হচ্ছেন কলকাতায়।"

রিক্সা আবার চলতে সুরু করলো। অরুণ কমলা খেতে খেতে রওনা হলো। বাড়ী ফিরেই দেখতে পেলে কলকাতা থেকে জ্যাঠামশায় এসেছেন। হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট তিনি। অরুণকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন, বিশেষতঃ অরুণের দুষ্টুমিটাকে। অরুণকে দেখতে পেয়েই তিনি হেসে বলে উঠলেন, এই যে অরু, এদিকে আয়! এক গাদা নালিশ তোর বিরুদ্ধে। তোর মতো দুষ্টু নাকি ভূ-ভারতে হয় না।

অরুণ একটু হেসে বললে, ঠিক তাই জ্যাঠামণি, দুষ্টু একটু বেশী হয়ে পড়েছি!

জ্যাঠামশায় হাসতে লাগলেন, সেই তো দরকার। রিকেট রোগী হয়ে বসে থাকার চেয়ে দুষ্টু হওয়া ঢের ভালো। চল্ আমার সঙ্গে কোলকাতায়, খুব ভালো স্পোর্টস্ হচ্ছে দেখে আসবি।

অরুণ সোল্লাসে বলে উঠলো, যাবো জ্যাঠামণি ।

অরুণের বাবা বললেন, এখানকার স্পোর্টসে অরুণই চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবার।

জ্যাঠামশায় হাসতে হাসতে বললেন, হবেই তো; স্পোর্টস্ম্যানরা স্বভাবতই একটু চঞ্চল হয়ে থাকে। তা তোমরা হয়েছ এমন, সামান্য একটু দুষ্টুমি দেখলেই শিশু-শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ খুলে বসো—ভাল ভাল বাণী শোনাতে, নয় ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখো না খেতে দিয়ে। তারপর অরুণের হাতের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ওটা কি কাগজ অরুণ ? তোর লেখা বেরিয়েছে বুঝি ?

অরুণ কাগজখানা জ্যাঠামশায়ের হাতে দিয়ে বললে, হাঁ জ্যাঠামণি ।

জ্যাঠামশায় কাগজখানা হাতে তুলে নিলেন। তারপর প্রশংসমান দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, এ যে বিলাতী কাগজ দেখছি। এতে তোর লেখা বেরোয় ? এ তো নামজাদা কাগজ। আশ্চর্য্য !

জ্যাঠামশায় অরুণের লেখাটা খুঁজে বের করলেন, তারপর সেটা পড়তে সুরু করে দিলেন ।

অরুণ বললে, লেখার জন্য দু পাউণ্ডের চেক পাঠিয়ে দেবে লিখেছে জ্যাঠামণি ।

জ্যাঠামশায় জবাব দিলেন না;—এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ।

স্পোর্টস্ দেখতে ময়দানে এসে অরুণ জিজ্ঞেস করলে, আমি স্পোর্টসে নাম দেবো জ্যাঠামণি।

জ্যাঠামশায় একটু হেসে বললেন, এ কলকাতা সহর অরুণ, কত ভাল ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান রয়েছে এখানে। এখানকার প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো কঠিন, আর তাছাড়া নাম দেবার সময় হয়তো চলে গেছে।

অরুণ অনুনয় করে বললে, আমি প্রাইজ চাই না জ্যাঠামণি, শুধু স্পোর্টসে থাকবো, এইটুকু চাই।

জ্যাঠামশায় একটু থেমে বললেন, এই স্পোর্টস্ সমিতির সম্পাদক আমার পরিচিত। আচ্ছা দেখি কিছু করা যায় কি না? অরুণকে সঙ্গে করে তিনি স্পোর্টস্ সমিতির ক্যাম্পে ঢুকে পড়লেন। অরুণ যখন সব গুলোতেই নাম দিয়ে বসলো, তখন সম্পাদক মশায় হেসে বললেন, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়বে খোকা। অরুণ শুধু হাসলো।

স্পোর্টস্ শেষ হয়ে গেলে দেখা গেল, প্রাইজের অনেকগুলোই অরুণ পেয়েছে। চ্যাম্পিয়ন সে হলো না বটে, কিন্তু চ্যাম্পিয়নের পরের স্থান অধিকার করার দরুণ নগদ দু'শো টাকা পুরস্কার পেলে সে। জ্যাঠামশায়ের বুক আনন্দে ফুলে উঠলো।

পরের দিন ভোর হতে-না-হতেই অরুণ টাকা ক'টি নিয়ে বের হয়ে পড়লো। বই কিনতে হবে তার। "ডিস্কভারী অফ ইণ্ডিয়া" নিতে হবে সবার আগে।

পোষ্টাফিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল অরুণ। দু'জন পোষ্টাফিস থেকে বেরিয়ে আসছিল। একজন বলে উঠলো, টেলিগ্রামের খরচা বেড়ে গিয়েছে। আজ এপ্রিলের মাস-পয়লা। হরেক রকম টেলিগ্রাম ছুটে চলেছে নানাদিকে। মজার কাণ্ড হবে এই সব টেলিগ্রাম যখন পৌঁছুবে।

দুষ্টু বুদ্ধি গজিয়ে উঠল অরুণের। তাইতো জরিমানার টাকাটা এখনও তার মাপ হয়নি। একবার যখন জমা হয়েছে তখন মাপ হওয়া সম্ভবপর হবে না। কমিটির সভ্যেরা যে মারমুখো হয়ে রয়েছে তার উপর, পেলে যেন গিলে খায়! সবাই তো কোলকাতা-মুখী হয়ে রয়েছেন। পয়লা এপ্রিলের এই আনন্দের দিনে তাঁদের সবারই তো কলকাতা আসা দরকার। অরুণ একটু হাসলে। তারপর টেলিগ্রাম অফিস থেকে কয়েকখানা ফরম নিয়ে একটা পার্কে গিয়ে বসলে।

তাড়াতাড়ি বই কেনা শেষ করে অরুণ জ্যাঠামশায়কে ধরে বসলো, বাড়ী যেতে মন চাইছে জ্যাঠামণি। গরমের বন্ধে আবার কলকাতায় আসবো। জ্যাঠামশায় পিঠ চাপড়ে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোর বাবাকে এই প্রাইজগুলো দেখাতে হবে। অরুণচন্দ্র কি কাণ্ড করেছে দেখুক সে।

জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দুপুরের ট্রেনেই অরুণ রওনা হলো দেশে। বিকেলে এসে ট্রেন থামলো তাদের শহরের ষ্টেশনে। অরুণ সোৎসাহে নামতেই দেখতে পেলে, স্কুল কমিটির সব সভ্যেরা জমায়েত হয়েছেন প্লাটফর্ম্মে। হঠাৎ পণ্ডিত

মশায়ের সামনে পড়ে গেল অরুণ। পণ্ডিত মশায় থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, অরুণ যে! কোলকাতা থেকে এলে বুঝি?

অরুণ থতমত খেয়ে গেল। জ্যাঠামশায় এগিয়ে এলেন। পণ্ডিত মশায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোলকাতায় যাচ্ছেন বুঝি? পণ্ডিত মশায় হেসে বললেন, আজ্ঞে হাঁ, আমার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মহেশ বাবুর ছেলের সঙ্গে। আজই টেলিগ্রাম করেছেন তিনি। পণের টাকা কিছুই নেবেন না। একটা পাকা বন্দোবস্ত করে আসি।

জ্যাঠামশায় অবাক হয়ে বললেন, আশ্চর্য্য! মহেশ বাবুর মতো কৃপণ লোকের এমন সুমতি!

পণ্ডিত মশায় হাত দু'টো কপালে ঠেকিয়ে বল্লেন, সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

জ্যাঠামশায় বললেন, কোলকাতার স্পোর্টসে অরুণ অনেক প্রাইজ পেয়েছে পণ্ডিত মশায়!

পণ্ডিত মশায় মাথা দুলিয়ে বললেন, পাবেই তো, ছেলে তো রত্ন বিশেষ, কিন্তু বড় দুর্দ্দান্ত।

জ্যাঠামশায় একটু হেসে অরুণকে নিয়ে রওনা হলেন।

মাস খানেক পরে আবার বসলো স্কুলের মিটিং। স্কুলের হল ঘরটার সারি সারি চেয়ারে কমিটির সভ্যগণ বসেছেন। একটা দামী কুশন চেয়ারে বসেছেন সভাপতি কালেক্টার সাহেব। স্কুলের আলোচ্য বিষয় এখনও আরম্ভ হয়নি।

আর কয়েকদিন পরেই পুরস্কার বিতরণ হবে। স্কুলের

একটা ঘরে ছেলের দল আবৃত্তি করে চলছিল। তাদের আবৃত্তির সুর ভেসে আসছিল এই হল ঘরের মধ্যে।

হঠাৎ কালেক্টার সাহেব বলে উঠলেন, অরুণের দু'টো লেখা বিলাতী কাগজে ছাপিয়েছে। লেখা দু'টো পড়লুম। একটা স্কুলের ছেলে যে এমনি চমৎকার লিখতে পারে এ আমার বিশ্বাস হয়নি প্রথম। পরে জানলুম অরুণেরই লেখা। আমি নিজেই হয়ত পারতুম না।

হেড মাষ্টার মশায় বললেন, অরুণ দু'পাউণ্ডের চেক পেয়েছে সেজন্য। কালেক্টার সাহেব বললেন, আমি জানি। কোলকাতার স্পোর্টসের সভাপতি খুব প্রশংসা করে জানিয়েছেন যে, আগামী স্পোর্টসে যেন অরুণকে আবার স্কুল থেকে পাঠানো হয়। এটা স্কুলের পক্ষে বিশেষ গৌরব;—নয় কি?

শিক্ষক প্রতিনিধি রমেশবাবু বল্লেন, ক্লাসে সে প্রথম হয়েছে, আর যে ছেলেটি দ্বিতীয় হয়েছে, সে ওর চেয়ে দু'শো নম্বর কম পেয়েছে।

এমনি সময়ে পণ্ডিত মশায় এসে ঘরে ঢুকলেন। রমেশ বাবুর শেষের কথা তাঁর কানে গিয়েছিল। তিনি বিরক্তির সুরে বললেন, পড়াশুনায় ভাল হলে কি হবে! এমন শয়তান ছেলে আর হয় না। এই দুর্দ্দিনের সময় একে ট্রেনে ওঠা যায় না, আর শয়তান ছেলেটা কলকাতা থেকে কতকগুলো মিথ্যে টেলিগ্রাম করে আমাদের সবাইকে এপ্রিল ফুল করে বসলে!

সবাই বিস্মিত হয়ে বললেন,—সে কি?

পণ্ডিত মশাই মাথা দুলিয়ে বললেন,—আমাকে নয়, আমাদের সবাইকে এপ্রিলের মাসপয়লা দেখিয়ে দিয়ে দিয়েছে। আমি নিজে সেদিন দেখেছি ওকে কলকাতা থেকে ফিরতে। ঐ ঘরে আবৃত্তি করছে এখনো। ডেকে জিজ্ঞেস করুন ওকে। ঠিক বলবে সে। মিথ্যা কথা তো বলে না কখনো।

স্কুলের সেক্রেটারী রায় বাহাদুর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। হাতের লাঠিটা নিয়ে তিনি দাঁড়ালেন, তাই নাকি, দেখাচ্ছি এপ্রিলের মাসপয়লা ওকে!

কালেক্টার সাহেব তর্জ্জনী ঘুরিয়ে তাকে বসিয়ে দিলেন। তারপর মাথা নেড়ে বল্লেন,—না না, তা হয় না রায় বাহাদুর। ছেলেটিকে নিজেই একটা পুরস্কার দেবো আমি। ঐ শুনুন মহাকবির উক্তি :—

'উদাত্তস্বরে আবৃত্তি ভেসে এলো,

"পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে করে।"

মাধবদা মোক্তারী করেন। পশার হয়েছে খুব। ব্যাঙ্কে টাকা, দোতালা বাড়ী, মোটর গাড়ী ; ইত্যাদি সব করেছেন। এক বাড়ী ভাড়া থেকেই মাসে তাঁর আয় হয় পাঁচশো টাকা করে। তা ছাড়া বেওয়ারিশ জমিজমাও হয়েছে তাঁর প্রচুর। জেলার কোন লোক একবার ওয়ারিশ না রেখে মরে গেলেই হয়! তখনই মাধবদা ছুটলেন সেখানে, ওয়ারিশ একটা খুঁজে বের করে তার কাছ থেকে একটা দলিল লিখে নিয়ে দেওয়ানী ফৌজদারী মামলা মোকর্দ্দমা এমনি বাধিয়ে তোলেন যে, সত্যিকারের ওয়ারিশ যদি কেউ থাকে তো পালিয়ে যেতে পথ পায় না। এমনি কুটবুদ্ধি তাঁর। কিন্তু এই বুদ্ধি আর ঐশ্বর্য্যের মূলে রয়েছে তাঁর ছাতি। অত্যন্ত সন্তর্পণে তিনি সব সময় সঙ্গে রাখেন সেটি।

ছাতিটার ইতিহাসটাও একটু ঘোরালো। কেউ কেউ বলেন, মাধবদার জন্মের আগেই এই ছাতি কেনা হয়েছিল ; কেউ বলেন, এটা তাঁর অন্নপ্রাশনের ছাতি, এ অবশ্য নিন্দুক-দের কথা। ছাতিটা অবশ্য তাঁর উপনয়নের সময় কেনা। তারপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আসছে। নেহাৎ রেলী ব্রাদার্সের ছাতি বলেই শিক-গুলো কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কাপড় ছিড়ে গেছে অনেক দিন। নানারকমের তালি জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে। চেহারা হয়েছে বহুরূপীর মত। ছাতিটা এখন আর খোলা যায় না। একটা সিল্কের সূতা দিয়ে সব সময় বাঁধা

অবস্থায় থাকে। কেউ মেরামত করার প্রস্তাব করলেই মাধবদা প্রবল বেগে তাড়া দিয়ে উঠেন।

ছাতিটা তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী সূচক, তাই তা নিয়ে কারো সমালোচনা মাধবদার সহ্য হয় না।

মাধবদা চিরকালই মোক্তার ছিলেন না। দুইবার এনট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করে তিনি প্রাইমারী স্কুলে চাকরী নিয়ে ছিলেন। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড হতে সামান্য সাহায্য পেতেন, আর ছেলেরাও কিছু বেতন দিত। এই ছিল তাঁর আয়। আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় তিনি শেষে গুরুট্রেণিং পরীক্ষা দিয়ে বসলেন। পরীক্ষায় পাশ করে তিনি মাইনর স্কুলে চাকুরী নিলেন। সেখান থেকেই আবার একটা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। এমনি সময়ে হঠাৎ তাঁর বিয়ে হয়ে গেল।

সংসারে ঢুকে তিনি দেখলেন এখানে দরকার শুধু টাকা। বড় বড় আদর্শ যা শিক্ষক-জীবনে তাঁর মনে জাগতো, অভাব অনটনে তা ভেসে গেল। শেষে একদিন বিরক্তি ভরে স্কুলের বার টাকা মাইনের চাকরী তিনি ছেড়ে দিলেন। বাইরে এসে দেখলেন, সংসারে উন্নতি করতে হলে বুদ্ধিমান হতে হবে তাঁকে, সাধারণ কথায় লোকে যাকে বলে ধড়িবাজ। ঘিয়ের সঙ্গে বাদাম তেল, চিনির সঙ্গে ময়দা, আর ময়দার সঙ্গে তেঁতুল বীচি মেশানোর কায়দা জানা না থাকলে ব্যবসা জমাতে জমাতে পটল তুলতে হবে তাঁকে। মাধবদারও তাই

হলো। গৃহিণীর গহনাগুলো স্যাকরার দোকানে দিয়ে মহাজনের দেনা শোধ করে তাঁর মুদিখানার অস্তিত্ব লোপ পেলো, যারা তাঁর দোকান থেকে বাকি নিয়েছিল, তারা ভুলেই গেল টাকা দিতে। মাধবদা অনেক ঘোরাঘুরি করে কিছুই আদায় করতে না পেরে বাকির সে খাতাখানা রাগ করে পুড়িয়ে ফেললেন।

খবর পেয়ে পাড়ার মামলাবাজ সুধীরবাবু এসে বললেন, এ কি করলে মাধব! নিজে আদায় করতে না পারলে খাতাখানা আমার হাওলা করে দিতে পারতে।

মামলা মোকর্দ্দমা করে টাকা পাওয়া যায়! সবিস্ময়ে বললেন মাধবদা।

সুধীরবাবু হেসে বললেন, লোক বুঝে পাওয়া যায় অবশ্য। মামলাবাজ হওয়া চাই—দেওয়ানী আর ফৌজদারীর ধারাগুলো সব ভাল করে জানা থাকা চাই। তারপর সময় বুঝে ঠুকে দিলেই বাস্।

মাধবদা তখনই আইনের দু'তিনখানা বই নিয়ে এসে পড়া আরম্ভ করে দিলেন। আইনের বই পড়ে মাধবদার মনে হলো, দুনিয়ার প্রত্যেক লোকই প্রতি মুহূর্ত্তে অপরাধ করে চলেছে। শুধু আইনটা জানেনা বলেই রক্ষে। আইনের আশ্রয় নিলেই সমস্ত লোক এসে জুটবে জেলখানার গেটের ভেতর, মায় ঐ হাকিমগুলো পর্য্যন্ত!

মাধবদা আইনের প্রাকটিক্যাল জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য সুধীর

বাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বহু মামলার সাজানো সাক্ষী হয়ে নির্ব্বিবাদে সত্যমিথ্যা বলে এলেন। উকিল মোক্তারের জেরাতে প্রথম প্রথম তাঁর একটু অসুবিধা হতো, কিন্তু শেষে জেরার অলিগলি যখন চিনে ফেললেন, তখন তাঁকে নড়চড় করা কঠিন হতো। ছাতিটি সজোরে হাতে চেপে তিনি মিথ্যার জাল বুনে চলতেন। ফলে বড় বড় উকিলকেও ঘেমে যেতে হতো তাঁকে জেরায় কাবু করতে। ফলে ফৌজদারী উকিল রমেশবাবু একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে আর ক'টাকা উপায় করবে মাধব, তার চেয়ে মোক্তারী পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল।

মাধবদা শেষকালে মোক্তারী পরীক্ষার ফি জমা দিয়ে দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা দিতে গিয়ে বাধা পেলেন পরীক্ষকের কাছে। মাধবদাকে তিনি বললেন, ছাতি নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ছাতি বাইরে রেখে আসার নিয়ম।

মাধবদার মুখ শুকিয়ে গেল। বুক দুর দুর করে উঠলো। ছাতিহীন অবস্থায় তিনি পরীক্ষা দেবেন কি করে। এই ছাতির জোরেই এত কাল জিতে এসেছেন সব মামলায়। আইনগুলো যা পড়েছিলেন তিনি, সব গেল ঘুলিয়ে। না, ছাতি ছাড়া অবস্থায় পরীক্ষা দেওয়া তাঁর চলবে না। সব অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হয় দেখে মাধবদা শেষে এক গল্প ফেঁদে বসলেন, যোগানন্দ স্বামীর নাম আপনি শুনেন নি? ত্রিকালজ্ঞ ঋষি তিনি।

হিমালয়ের গুহায় কত বছর হলো তপস্যা করে আসছেন তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। আমার মরণোন্মুখ অবস্থার সময় তিনি এসে রক্ষা করেন আমাকে। তারপর আমাকে দিয়ে যান এই ছাতি। বলে যান, এই ছাতি হারিয়ে গেলে আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পর্য্যন্ত নাকি লোপ পেয়ে যাবে। একেবারে সেই থেকে মুহূর্ত্তের জন্যও এই ছাতি আমি কাছ-ছাড়া করিনে স্যার।

পরীক্ষক মুখ টিপে একটু হাসলেন, আপনি কি নওগাঁ থেকে আসছেন ?

মাধবদা তৎক্ষণাৎ মাথা দুলিয়ে বললেন, না গাঁজা আমি খাইনে, তবে ছাতিটা দেখে অনেকে আমাকে তাই বলেন বটে। জীবন মরণ সমস্যা যেখানে, তা নিয়ে তো ঠাট্টা করা চলে না।

পরীক্ষক বলে উঠলেন, না আমি ঠাট্টা করছিনে। তারপর ছাতিটা উল্‌টে পাল্‌টে পরীক্ষা সুরু করে দিলেন। তালি দেওয়া কাপড়গুলো পর্য্যন্ত নাড়াচাড়া করে দেখলেন, ওর ভেতরে কোন কাগজ-পত্র রয়েছে কি না ?

মাধবদা ব্যথিত হয়ে বললেন, অমন করে নাড়াচাড়া করবেন না স্যার, ছাতির কাপড় ছিড়ে যাবে।

পরীক্ষক ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললেন, না আপনার এই মূল্যবান্ সন্ন্যাসী প্রদত্ত সম্পত্তি আমি নষ্ট করতে চাইনে, তবে এটা আমার কাছে জমা রইল, পরীক্ষার শেষে নিয়ে যাবেন।

মাধবদা মর্ম্মাহত হয়ে জানালেন, তাহলে আমার পরীক্ষা দেওয়াই হবেনা স্যার। ছাতিটা ফিরিয়ে দিন, আমি চলে যাই।

মাধবদা সত্যিই চলে যান দেখে পরীক্ষক তাঁকে ডেকে বললেন, আচ্ছা দিন ছাতিটা। আপনার চোখের সামনে ঘরের কোণে রাখা হবে। অগত্যা মাধবদা তাতে সম্মতি দিলেন।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলো সেবার একটু কঠিনই হয়েছিল। প্রশ্নপত্র দেখে মাধবদার চক্ষু প্রায় স্থির হয়ে গেল। পাশ করা একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হলো, কিন্তু ছাতি তাঁর সহায়, কাজেই বিপন্মুক্ত হতে বেশী বেগ পেতে হলো না তাঁকে।

মাধবদার সামনে যিনি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন, আইন বইটা তাঁর বোধ হয় কণ্ঠস্থ ছিল। মাধবদা বেমালুম টুকে নিলেন সব। পরীক্ষক ভাবলেন, মাধবদা বোধহয় সন্ন্যাসী প্রদত্ত ছাতির ভেতর থেকে শক্তি সঞ্চয় করছেন। কাজেই পরীক্ষা-সাগর মাধবদা নির্বিবঘ্নে পার হয়ে গেলেন। গেজেটে নিজের নামটা দেখে নিয়ে তিনি ছাতিটায় আর একটা তালি লাগিয়ে নিলেন।

এরপর থেকে মাধবদার মোক্তারী স্বরু হলো। অসীম ধৈর্য্য তাঁর। হাকিম ক্রমশঃ না, না, করেই যাচ্ছেন। মাধবদা যেন সেকথা শুনেও শুনছেন না। শেষে বিরক্ত হয়ে মাধবদার

পক্ষেই রায় দিয়ে হাকিম তাঁকে এড়াতে চাইতেন। কোন মোকর্দ্দমায় মাধবদাকে মোক্তার হয়ে আসতে দেখলেই হাকিমের পর্য্যন্ত মুখ যেতো শুকিয়ে। এমনি একটা বিপর্য্যয় অবস্থা সুরু হতো, যেন হাকিম মাধবদাকে প্রহার করছেন। এমনি নাছোড়বান্দা মোক্তার ছিলেন তিনি। মক্কেল একবার মাধবদার খপ্পরে পড়লেই হয়। আইনের ধারা থেকে নানারকম সম্ভাব্য অসম্ভাব্য বিপদের ছায়া তাদের সামনে তুলে দিতেন তিনি যে, তা থেকে রক্ষা পেতে হলে একমাত্র ত্রাণকর্ত্তাই যেন তিনি। অন্যত্র গেলেই তার পদে পদে বিপদ। জেলের দরজা যেন একেবারে খুলে তাকে ডাকছে। আদায়ের পন্থাও তাঁর নানারকম। এমনিভাবে মক্কেলের পকেট খালি করে দিতেন যে, তারা সেটা জেনেও জানতে পারতো না। এমনি চলতে চলতে তাঁর পশারও গেল বেড়ে। মক্কেলের দলও ভিড় করতো বেশী।

সেবার একটা জটিল মোকর্দ্দমায় মোক্তার হয়েছেন তিনি। তাড়াতাড়ি গিয়ে মক্কেল তাঁকে ডেকে নিয়ে আসায় ছাতিটা ভুল করে তিনি লাইব্রেরীতেই রেখে এলেন। মক্কেল ছাতিটার মহিমা জানতো। তাড়াতাড়ি সেটা এনে এজলাসের এককোণে মাধবদার চোখের সামনে রেখে দিল। মাধবদা মামলার নথি দেখতে লাগলেন। নূতন হাকিমের এজলাসে পিওনটা এসেছে নূতন। এজলাসের ভেতর অদ্ভুত

ছাতি দেখে তার পিত্ত জ্বলে উঠল। জানলা গলিয়ে ছাতিটা সে ফেলে দিল বাইরে। মাধবদা জেরা করতে উঠলেন।

সাক্ষীকে চেপে ধরলেন তিনি। সাক্ষী এলোমেলো কথা বলতে সুরু করবার উপক্রম করলে। এমনি সময় মাধবদা ছাতিটা দেখতে না পেয়ে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলেন, আরে ছাতিটে কই ?

সাক্ষী তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, ছাতি তো ছিল না।

মাধবদা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, আমি নিজে দেখলুম আছে, আর তুমি বলছ ছিল না,—কে নিলে ?

সাক্ষী বিরক্ত হয়ে বলল, ছাতি মোটেই ছিল না। নেবে আবার কে ?

মাধবদা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, বললেই হলো, তালি দেওয়া ছাতি ছিল না, বেকুব কোথাকার।

সাক্ষী অস্থির হয়ে উঠলো। হাকিম ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, এ কি রকম ব্যবহার আপনার মাধববাবু, আদালত অবমাননার দায়ে আপনাকে অভিযুক্ত হতে হবে।

মাধবদা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, হুজুর আমার ছাতিটা কে যেন নিয়েছে এই কোর্টের ভেতর থেকে। এ শুধু আমাকে জব্দ করার ফন্দী।

কোর্টের ভেতর একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। কোর্টের ভেতরে চুরি! হাকিম খুব রেগে উঠলেন। ছাতি খুঁজে বের করা চাই। ব্যাপার দেখে পিওনটা হন্তদন্ত হয়ে বাইরে

থেকে ছাতিটা কুড়িয়ে এনে হাকিমের কাছে পৌছে দিল। হাকিম অতি কষ্টে হাসি চেপে বললেন, এ ছাতিটাই আপনার নাকি ? মাধবদা ছাতিটা লুফে নিয়ে ধুলোগুলো আচকান দিয়ে মুছে ফেলতে ফেলতে বললেন, আজ্ঞে হাঁ হুজুর।

প্রতিপক্ষের মোক্তার বললেন, আচকানের মধ্যে রাখুন, হারানোর ভয় থাকবে না। এজলাসে একটা হাসির কলরোল বইলো। মাধবদা ছাতিটা কাছে রেখে আবার উঠে দাঁড়ালেন সাক্ষীকে জেরা করতে। শেষে মামলায় তাঁরই জয় হলো। মক্কেলের কাছ থেকে প্রচুর টাকা পেলেন তিনি। ছাতিটায় আবার একটা নতুন তালি পড়লো।

এমনিভাবে তালির উপর তালিগুলি তাঁর জয়ের প্রতীক হয়ে ছাতিটায় শোভা পাচ্ছিল। বার্দ্ধক্যের দুয়ারে এসে পৌঁছেছেন তিনি, পরিশ্রমের আতিশয্যে হাঁপানি রোগটারও প্রকোপ হয়েছে বেশী। দিনরাত ঔষধের উপরই থাকতে হয় তাঁর। জটিল মোকর্দ্দমা ছাড়া আর তিনি নিতে পারেন না মোটেই। আর্থিক আয়ের অসঙ্গতি এখন নেই, কিন্তু আকাঙ্খা যেন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

সেদিন সকাল থেকেই হাঁপানির টানটা একটু সুরু হয়েছে। এক মক্কেল এসে ধরলো মোকর্দ্দমার ভারটা তাঁকে নিতেই হবে। জিততে পারলে পাঁচশো টাকা নগদ। টাকার পরিমাণ শুনে হাঁপানির টানটা যেন একটু কমে এলো। মাধবদা রাজী হলেন।

মামলার ডাক পড়তেই মাধবদা চলে এলেন। হাকিমকে মোকর্দ্দমা বোঝাতে সুরু করে দিলেন তিনি। দু' এক মিনিট বলতেই মাথা তাঁর যেন ঘুরে উঠলো। তিনি টলে পড়লেন। সকলে মিলে ধরাধরি করে তাঁকে মোক্তার-লাইব্রেরীতে নিয়ে এলো। মাধবদার মোটর নিয়ে ছুটে চললো সকলে ডাক্তারের কাছে। দেখতে দেখতে ডাক্তার এলো, ইনজেকসন দেওয়া হলো, মাধবদার জ্ঞানও ফিরে এলো। উঠে বসেই তিনি বললেন, মামলাটার কি হলো।

একজন মুহুরী বলে উঠলো, মামলা হয়ে গেছে। অন্য মোক্তার করেছেন সে মামলা।

মাধবদা হায় হায় করে বলে উঠলেন, মাথা ঘোরাটা যদি আধ ঘণ্টা পরে হতো, তাহলে পাঁচশো টাকাটা ফসকে যেতো না। মাঠে মারা গেল সব। এখন আবার দিতে হবে ডাক্তারের ভিজিট, ওষুধের দাম। ছাতিটা না এনেই এই ল্যাঠা হলো। সঙ্গে থাকলে এই দুর্ভোগটা ভুগতে হতো না। মাধবদাকে ধরাধরি করে মোটরে তুলে দেওয়া হলো। সবাই ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলে গেলেন।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাধবদার ছাতির প্রীতি যেন বেড়েই চলেছিল। জীর্ণ ছাতিটাকে কোন দিন খোলা যেত না বটে, কিন্তু ফস করে নাড়াচাড়ার ফলে তালিগুলো ছিড়ে যেতো। অমনি একটা নূতন তালি এসে সে স্থান পূরণ

করে দিত। ছাতিটার প্রথম কাপড় কত পর্দ্দার নীচে যে তলিয়ে গিয়েছে তা উপরটা দেখে বোঝার কোনই উপায় ছিল না।

প্রতিবছর পূজা ও বড়দিনের ছুটিতে মাধবদা যেতেন বায়ু পরিবর্ত্তন করতে। সেটা অবশ্য পশ্চিমের কোন সহর বা স্বাস্থ্য-নিবাসে নয়। জেলারই কোন মক্কেলের বাড়ী,—যিনি এই চেঞ্জের ভার বহন করে থাকেন। দুইবার অবশ্য কলকাতায় গিয়েছিলেন,—সেও মক্কেলের টাকায়। নিজের টাকা এমনি ভাবে খরচ করা তিনি অপব্যয় বলে মনে করেন। মোট কথা একটা পয়সা তিনি প্রাণ খুলে খরচ করতে চাইতেন না। ফলে টাকাগুলো একবার সিন্দুকে ঢুকলে একমাত্র ব্যাঙ্কে যাবার সময় ফিরতি মুখো হতো।

অথচ মাধবদার ওয়ারিশের মধ্যে ছিল একটি মাত্র মেয়ে। ফুটফুটে সুন্দর; ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছে তাঁর। বিদ্বান্ পাত্র অবশ্য মাধবদা খোঁজেন নি, মাধবদার ধারণা, বিদ্বান্ পাত্ররা কেবলমাত্র টাকা খরচ করবার ফন্দীই খুঁজে বের করেন। জামাই অবশ্য তাঁর অগাধ টাকার সন্ধান পেয়ে শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন। ছাতিটার খুব তোয়াজ করে চলেন তিনি। মাধবদাও সেজন্য খোস মেজাজেই থাকেন তার উপর।

পাব্লিক প্রসিকিউটার সত্যকিঙ্কর বাবু এসে ধরে বসলেন, ছেলের বিয়ে, মাধবদাকে বরযাত্রী হতে হবে।

মাধবদা আপত্তি জানালেন, সে কি করে হয় ? শরীরের এই অবস্থা।

সত্যবাবু হেসে বললেন, সেজন্য কোন চিন্তা নেই। দিনে-দিনেই যাওয়া, অসুখে আটকাবে না ; তা ছাড়া বরযাত্রীদের মধ্যে ডাক্তারও থাকবে। ইনজেকসনের সিরিঞ্জটা নিলেই চলবে।

মাধবদা বলে উঠলেন, এখানকার কেসগুলো সব রয়েছে—

বাধাদিয়ে সত্যবাবু বললেন, সে আমি জানি। মাধবদা যে বিনা পয়সায় এক পা নড়বেন না। দরদরিয়ার চর নিয়ে যে হাঙ্গামা হয়ে গেল সেদিন, সে মামলাটার ভার আপনার উপরেই দেওয়া হবে। ওখানকার জমিদার আপনার সঙ্গে এ বিষয় আলাপ করতে চান। জমিদারের বাড়ীর কাছেই ছেলের বিয়ে ; সুতরাং আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আর যখন আপনি ন্যায্য ফি পাচ্ছেন, তারপর বড় একটা মামলা, সুতরাং আপনার কোন আপত্তির কারণই দাঁড়াতে পারে না।

মাধবদার মুখে হাসি ফুটল।—না আপত্তি আর নেই, তা কখন তোমরা রওনা হচ্ছ ? ছাতি নিয়ে ষ্টেশনে আমি উপস্থিত থাকবো।

সত্যবাবু নিষেধ করে বললেন,—ঠিক সময় খবর পাঠাবো, কিন্তু ঐ ছাতিটা নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না মাধবদা। বড় লোকের বাড়ী ছেলের বিয়ে দিচ্ছি, তুমিও

যাচ্ছ জমিদারের বাড়ী কেস নিতে। এখন তোমার হাতে ঐ ছাতিটা দেখলে কি ভাববে সবাই বল দেখি। শেষকালে সঙ্গীন কেস হয়তো অন্যের হাতেই তুলে দেবে। অনেক-গুলো টাকা নষ্ট হয়ে যাবে।

মাধবদা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তাহলে আমার যাওয়া হবে না সত্য। ছাতি ছেড়ে আমি এক পা নড়তে চাইনে।

সত্যবাবু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, সে কি ?

মাধবদা দৃঢ়ভাবে বললেন, ঠিক তাই। ছাতিই আমার ধ্যান জ্ঞান সব। তোমরা এসব নিয়ে ঠাট্টা করো আমার ভাল লাগে না। ছাতিটা নিয়ে যদি জমিদারের বাড়ী না যাওয়া যায়, তবে যাব না। একটা কেসের মায়ায় ছাতিটা তো আর ছাড়তে পারবো না।

সত্যবাবু সায় দিয়ে বললেন, সে আমি জানি। কিন্তু তোমার ছাতিটার যা অবস্থা হয়েছে আজকাল, লোকে দেখলে বলবে কি ?

মাধবদা উত্তর দিলেন, যার যা ইচ্ছে বলুক, তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না ; ছাতি ছাড়া আমি এক পা চলিনে, তোমরা সব জানো,—তা তোমার বিয়ে বাড়ীই হোক, কি জমিদার বাড়ীই হোক।

অগত্যা সত্যবাবু সম্মত হলেন। যথাসময়ে লোক পাঠাবেন জানিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মাধবদা বরযাত্রীদলের সঙ্গে রওনা হলেন। মাধবদার স্বাস্থ্যহীনতার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেনা হয়েছিল। ছাতিটা নিয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে গিয়ে উঠে বসলেন।

গাড়ীতে ছিলেন চা বাগানের দুই সাহেব। একে তো একজন কালা আদ্‌মি প্রথম শ্রেণীতে উঠে পড়েছে, তারপর ঐ নোক্‌রা ছাতিটা নিয়ে। সাহেবদ্বয় যুগপৎ ছুটে এসে জানালেন, এহি ক্যামরা নেহি হ্যায় তোম্‌রা লোককো বাস্তে।

মাধবদা শশব্যস্তে প্রথম শ্রেণীর টিকিটটা দেখিয়ে উঠে পড়লেন। হাঁপানির টানটা সাহেবের ভয়ে যেন বেড়ে উঠলো।

ব্যাপার দেখে সাহেবরা সরে দাঁড়ালেন। একজন বলে উঠলেন 'থাইসিস্'। মাথা প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে মাধবদা জানালেন, না থাইসিস নয় হাঁপানি, মানে এজমা, ভয়ের কারণ নেই।

সাহেবরা পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। একজন বিরক্তিভরে ইংরাজীতে বললেন,—এই বেগারটা ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট পেল কোত্থেকে। একে নামিয়ে দেওয়া দরকার।

গাড়ী তখন চলতে সুরু করে দিয়েছে। মাধবদা আঁৎকে উঠলেন। গাড়ীর মধ্যে একলা রয়েছেন তিনি।

সাহেব দুটো বেশ জোয়ান, জানালা টপকিয়ে যদি তাঁকে ফেলে দেয়, নালিশ করবার জন্য কেউ থাকবে না। যদি বেঁচেই যান, নালিশ করলেই বা কি হবে। ঐ সাহেবদের বিরুদ্ধে তো নালিশ চলবে না। তারা তখন কোথায় থাকবে ? আর সাক্ষীই বা পাবেন কোথায় ? এদেশে সাহেবের তো সাত খুন মাপ। মোক্তারী-জীবনে এরকম অনেক দেখেছেন তিনি।

সাহেব দু'টোকে তাঁর দিকে এগোতে দেখে মাধবদা জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে ডেকে উঠলেন, "সত্য" "সত্য"। চলমান গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে তাঁর আহ্বান মিলিয়ে গেল। একটা আশঙ্কায় মাধবদার মন ভরে গেল।

সাহেবদের একজন মাধবদার ঠিক সামনাসামনি এসে দাঁড়ালো। ছাতিটা তুলে ধরলো শূন্যে, তারপরে সেটা ভালভাবে দেখে জিজ্ঞেস করলে, "হোয়াট ইজ দিস্ ?"

মাধবদার হৃদয় দুরদুর করে কাঁপছিল। বড় বড় হাকিমের কঠিন ব্যবহার দেখেও তাঁর মন কোনদিন কাঁপেনি। কিন্তু এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর মন খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। কি কুক্ষণেই তিনি এই গাড়ীতে এসে উঠেছিলেন। ছাতিটা যদি মাঝ পথে ফেলে দেয়, আর ফিরে পাবার কোন আশাই থাকবে না। শুষ্ককণ্ঠে মাধবদা জানালেন, ছাতি স্যার, মানে অ্যামব্রেলা।

সাহেবেরা দু'জনে উচ্চ হাস্য করে উঠলো। এটা যে

কেমন ছাতি তারা ভেবেই ঠিক করতে পারলে না। একজন সিল্কের সূতাটি ছিড়ে ছাতিটি খুলবার চেষ্টা করতে লাগলো। ছাতিটি অদ্ভুতভাবে বেঁকে গিয়ে প্রবলভাবে আপত্তি জানাতে সুরু করে দিল। মাধবদার মনে হলো সাহেবরা যেন তাঁর বুকের পাঁজরা থেকে হাড়গুলো পর্য্যন্ত তুলে নেবার চেষ্টা করছে।

অনেকক্ষণ ধরে ব্যর্থ চেষ্টা করে সাহেবটা ছাতিটাকে গাড়ীর মধ্যেই ফেলে দিয়ে বললে, ন্যুইস্যান্স। অন্য সাহেব ইংরাজীতে উপদেশ দিলে, বাইরে ফেলে দাও ওটাকে।

মাধবদা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ছাতিটার উপর। প্রাণপণ চেষ্টায় কোলের মধ্যে সেটা আঁকড়ে রেখে উচ্চস্বরে বলতে সুরু করে দিলেন 'নো স্যার, নো স্যার'। সাহেবরাও ব্যাপার দেখে রসিকতা সুরু করে ছাতি টানাটানি সুরু করে দিলে। ছোটখাট টাগ্ অফ ওয়ার বেঁধে গেল।

মাধবদার হাঁপানির টান বেড়ে গেল। চোখ দুটো প্রায় কপালে উঠবার উপক্রম হলো। শেষকালে প্রবল ভাবে কাসতে সুরু করে দিলেন তিনি। সাহেবরা সচকিত হয়ে দূরে সরে গিয়ে রুমালে নাক চাপা দিলে।

গাড়ী এসে থামলো পরের ষ্টেশনে। মাধবদা চট করে উঠে দরজা খুলে নেমে পড়লেন ছাতিটা সঙ্গে নিয়ে। পাশেই ছিল সার্ভেন্ট ক্লাস, তাতেই উঠে পড়লেন তিনি। সুটকেশ বিছানা ফাষ্ট´ক্লাসেই রইলো পড়ে।

পিওনদের দল চেঁচামেচি সুরু করে দিল ছাতিটা দেখে। হাসাহাসির হুল্লোড় পড়ে গেল তাদের মধ্যে। একজন ছাতিটা টেনে ধরে বলে উঠল, ছাতিটা বেচে দাও ভাই। ক'শো টাকা নেবে? মাধবদা মোক্তারী ভাষায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

দেশী ও বিলাতী সাহেবদের পিওন। বিশেষতঃ সাহেবরা সঙ্গেই রয়েছেন। তাদেরও সাহেবী মেজাজ ফুটে উঠল। একজন ধমকে উঠল, "চোপ রও"।

মাধবদা কট্‌মট্‌ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইলেন। এতো আর বিলাতী সাদা সাহেব নয় যে তাকে ভয় করতে হবে। এদের জন্য সারা পেনাল কোডের শ'কয়েক আইন-কানুন আছে। তার যে কোন একটাই এদের পক্ষে যথেষ্ট। পিওনের দল ঘিরে ধরল তাঁকে চারিদিক থেকে। ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। মাধবদা পকেট থেকে ফাষ্ট´ ক্লাসের টিকিট বের করে তাদের দেখিয়ে বললেন, ফাষ্ট´ ক্লাসের প্যাসেঞ্জার আমি, বিরক্ত করলে ভাল হবে না বলছি। ফাষ্ট´ ক্লাসের টিকিট তারা ভাল ভাবেই চেনে। পিওনের দল মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতই নুয়ে পড়লো। মাধবদা সগর্ব্বে বসে পড়ে ছাতিটা তাদের সামনেই রেখে দিলেন।

বিয়ে বাড়ীর হৈ চৈ বেশ ভাল ভাবেই জমে উঠেছিল। মাধবদা ছাতিটাকে সব সময়েই কাছে রাখতেন, ভয় পাছে

হারিয়ে যায়। ছাতিটার দর্শনার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে দেখে মাধবদা সেটাকে খবরের কাগজে মুড়ে ফেললেন। প্রকৃতরূপ দেখতে না পেয়ে পরবর্ত্তী দর্শকরা হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

বিয়ের আসরে যোগ দেবার জন্য সবার ডাক পড়ল। মাধবদাও ছাতি নিয়ে তাদের সঙ্গে রওনা দিলেন। বড়-লোকের বাড়ীতে বিয়ে। ভিড়ও হয়েছে তেমনি। মাধবদা ছাতির বাঁট সজোরে চেপে ধরে অগ্রসর হলেন। ভিড়ের চাপে ছাতিটা তাঁর হারালো না বটে, কিন্তু খবরের কাগজের মোড়কটা হারিয়ে গেল। মাধবদা দূরে আসরের এক কোণে বসে রইলেন। কি জানি ভিড়ের চাপে যদি ছাতি হারিয়ে যায়! অনেকগুলো দুঃস্থ লোক সেখানে দাঁড়িয়ে বিয়ের উৎসব দেখছিল।

বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল। এবার আশীর্ব্বাদের পালা। সবাই একে একে বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলো। এমনি সময় সত্যবাবু বলে উঠলেন "মাধবদা কৈ ?"

দেখা গেল মাধবদা এককোণে জড়সড় হয়ে বসে রয়ে-ছেন। সত্যবাবু সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই মাধবদা বলে উঠলেন, থাক্ ভাই, আমি এখান থেকেই আশীর্ব্বাদ করছি। সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, তাকি হয়? আপনাকে উঠতে হবে। পীড়াপীড়িতে মাধবদা উঠে এলেন। ছাতিটা সেখানেই পড়ে রইল।

আশীর্ব্বাদের রকমারি ঘটা সুরু হলো। মাধবদা ছাতির জন্য অস্থির হচ্ছিলেন মনে মনে। অন্যমনস্কভাবে উঠে আসার সময় ছাতিটা কারও হাতে দিয়ে আসতে পারেন নি তিনি। শেষকালে ধানদূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ সেরে ভিড় ঠেলে তিনি স্বস্থানে ফিরে এলেন। আব্ছা অন্ধকারে তিনি ছাতির উপর হাত রেখেই বসে পড়লেন।

একটু পরেই খাবারের ডাক পড়লো। সকলের সঙ্গে মাধবদা ছাতি হাতে রওনা হলেন। আহারের জায়গায় লোকজনের ভিড় বেশী ছিল না। অনেকগুলো পেট্রোল ল্যাম্প জ্বলে জায়গাটাকে দিনের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বর-যাত্রীদলের যদুবাবু ঠাট্টা করে বললেন, মাধবদার কি খাবার সময়ও ছাতি সঙ্গে থাকবে নাকি ?

মাধবদা বিরক্তভাবে বললেন, তাতে তোমার কি আসে যায় ? তারপর ছাতিটাকে ভাল করে ধরবার চেষ্টা করতেই ছাতির রূপ দেখে আঁৎকে উঠে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, এ কি রকম ব্যবহার যদু, ছাতি নিয়ে ঠাট্টা ? ফিরিয়ে দাও বল্‌ছি।

যদুবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি? কি ফিরিয়ে দেব আমি ?

মাধবদা দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠলেন, ভাল হবে না বলছি! শিগ্‌গির ফিরিয়ে দাও। এ সব নিয়ে ঠাট্টা ভাল লাগে না।

যদুবাবু বিরক্তিভরে বললেন, কি বলছেন আপনি ?

মাধবদা চেঁচিয়ে বললেন, বলছি তোমার মাথা আর মুণ্ড।"

বিয়ে বাড়ীতে গণ্ডগোল। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। সত্যবাবু ছুটে এলেন সেখানে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে মাধবদা ?

মাধবদা পরুষ কণ্ঠে বললেন, জিজ্ঞেস করো সেটা ঐ যদুবাবুর কাছে। ঠাট্টার একটা সীমারেখা আছে। ছাতি নিয়ে ইয়ার্কি আমার ছু'চক্ষের বিষ। সত্যবাবু মাধবদার হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, ছাতির আবার কি হলো ? ছাতি তো তোমার হাতেই রয়েছে মাধবদা! হাত না দেখেই মাধবদা হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, এই ছাতি আমার ? তুমি তাই বলতে চাও সত্য। আমার ছাতির এই কয়েকটা মাত্র তালি ? যেদো ভেবেছে এই তালি মার্কা ছাতি রেখে দিলেই আমি বুঝি আর টের পাবো না। আমার ছাতি বের করে দিক এখনি।

যদুবাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, ভালো রে ভাল, আপনার ছাতি আমি নিতে যাব কেন ? আর ছাতিটার যা চেহারা, হাজার তালি দেওয়া ;—সে ছাড়া আমি এ নিয়ে কি করবো ?

মাধবদা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, ওসব ইয়ার্কি রাখো। ছাতি কোথায় রেখেছো বের করে দাও, নইলে রক্তগঙ্গা করে ছাড়ব। নিয়ে যাও তোমার এই ওঁচা ছাতি।

মাধবদা যদুবাবুর প্রায় নাকের ডগা লক্ষ্য করেই ছুড়ে ফেলে দিলেন ছাতিটা। যদুবাবু সভয়ে সরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করলেন। ছাতি নিয়ে ব্যঙ্গ করে কি বিপদেই পড়লেন তিনি।

ব্যাপারটা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো দেখে কন্যাপক্ষ বরপক্ষ উভয়ে মিলে যদুবাবুকে নানা অনুরোধ উপরোধ জানাতে সুরু করে দিলেন।

যদুবাবু প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে এর বিন্দু বিসর্গও যে তিনি জানেন না বারবার তাই জানাতে সুরু করে দিলেন। বিয়ে বাড়ীর সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। জানা অজানা দুষ্টু ছেলেদের ধরে নানারকম জেরা ও প্রলোভন দেখানো হলো; কিন্তু কোথাও ছাতির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধবদা অত্যন্ত রেগে বলে উঠলেন, ছাতি না পাওয়া গেলে এ বাড়ীতে জলস্পর্শ করবো না আমি।

উভয় পক্ষ প্রমাদ গণলেন। শেষে কন্যাকর্ত্তা বরের জন্য কেনা দামী ছাতিটা হাতে করে গললগ্নী-কৃতবাসে মাধবদার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রস্তাবটা শুনেই মাধবদা আরো রেগে উঠলেন। শেষে ছাতিটা কন্যাকর্ত্তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, একটা ছাতি কিনে নেবার সঙ্গতি আমার আছে,—কিন্তু সেই ছাতিটাই আমার চাই।

অনুনয় বিনয় সব ব্যর্থ হলো। মাধবদা সত্যই জলস্পর্শ করলেন না। অগত্যা সকলে অনেক রাত্রে

মাধবদাকে বাদ দিয়েই আহারে বসলো। কেবল সত্যবাবু অভুক্ত থেকে ছাতিটার সন্ধান করতে লাগলেন। শেষরাত্রে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে এসে জানালেন, ছাতিটার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না মাধবদা। সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে।

মাধবদা গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। সত্যবাবু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আর কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যঘরে চলে গেলেন।

ভোর হবার একটু আগে মাধবদা বিছানা থেকে উঠলেন। সারারাত তিনি মোটেই ঘুমোননি। সকলের অলক্ষিতে বিয়ের আসরে এসে উপস্থিত হলেন। যেখানটায় ছাতি রেখেছিলেন সেইশূন্য স্থানটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর সটান ষ্টেশনের পথে রওনা দিলেন। বিছানা আর সুটকেসের কথা তাঁর মনেও হলো না।

সকালের গাড়ী আসার তখনও প্রায় একঘণ্টা দেরী। ফিরে যেয়ে ছাতিটার সন্ধান করবেন কিনা এই ভাবতে ভাবতে তিনি পায়চারী সুরু করে দিলেন।

সত্যবাবু ঘুম থেকে উঠে মাধবদাকে দেখতে না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মামলা সম্বন্ধে আলোচনা এখনও শেষ হয় নি মাধবদার। ছাতির শোকে তিনি সব ভুলে গেলেন নাকি? কন্যাপক্ষের একজন তাঁকে খবর দিল, তিনি ষ্টেশনের দিকে চলে গেছেন। গাড়ী ছাড়বার তখনও আধ

ঘণ্টা দেরী। সত্যবাবু, কন্যাকর্ত্তা এবং আরো দুচার জন লোক নিয়ে ছুটলেন ষ্টেশনে মাধবদাকে ফিরিয়ে আনতে।

মাধবদা কিছুতেই ফিরতে চাইলেন না। গাড়ীও ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো। মাধবদা তাতে চড়ে বসলেন। গার্ড হুইসিল দিল। গাড়ী এখনই ছাড়বে। সত্যবাবুরা সরে দাঁড়ালেন। একজন ভিখারী এসে গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে বললে, জয় হোক্ বাবা দুটো পয়সা ভিক্ষে দিন। মাধবদা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। সহসা ভিখারীর হাতের ছাতিটা দেখে প্রায় চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে বললেন, সত্য এই আমার ছাতি—

ভিখারী কুণ্ঠিত হয়ে বললে, কাল এক বিয়ে বাড়ীতে বদল হয়েছে বাবু।

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন, মাধবদা একটা দামী রুমাল দিয়ে ছাতিটার ধূলো ঝাড়ছেন।

বিনুর মা বললেন, যা গরম পড়েছে, একবার পাহাড়ে যেতে পারলে হয়। বিনুরও পরীক্ষা হয়ে গেল। অসুবিধা তো কিছু নেই।

বিনুর বাবা বললেন, সর্ব্বনাশ, আজকাল কি কোথাও যাবার উপায় আছে নাকি? ট্রেণে যা ভিড়, তা ছাড়া নড়াচড়া করতে গেলেই একরাশ টাকাও বেরিয়ে যাবে।

বিনুর মা বললেন, ব্যাঙ্কে একরাশ টাকা রেখে কি হচ্ছে শুনি। যুদ্ধের আগে বলতে আট আনায় ধানের মণ বেচে জমির খাজনা দেওয়াই যায় না। যুদ্ধের সময় নানান বিপদের কথা বলে ভুলিয়ে রাখতে। এখন তো আর কোন বাধা নেই। কেবল কয় বছর ধরে টাকাই জমাচ্ছ। দশ বছর ধরে শুধু বলে আসছ পাহাড় দেখিয়ে আনবে। সে কি শুধু মুখের কথা। এবার আমাদের যেতেই হবে।

বিনুও বায়না ধরলে, চলো বাবা অনেক দিন থেকে পাহাড় দেখবার ইচ্ছে করছে, কত টাকাই বা লাগবে?

বিনুর বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, টাকার জন্য চিন্তা করিনে, কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধার কথা চিন্তা করলে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। তোমার মাকে তা বোঝানো যাবে না। আচ্ছা, সবার যখন যাবার ইচ্ছে, চলো। তবে বেশী জিনিষপত্র সঙ্গে নেওয়া চলবে না।

বিনু তার ছোট তিন ভাই আর দুই বোনকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগে গেল লগেজের বহর সংক্ষেপ করতে। পনের

দিন লাগলো এই সব জিনিষপত্র ঠিক করে নিতে। অবশেষে একটা শুভদিন দেখে তিনটা গরুর গাড়ী বোঝাই করে বিনুদের সবাই চললো দশ ক্রোশ দূরের ষ্টেশনে। এ ছাড়া সঙ্গে চললো চাকর মহেশ ও গোমস্তা হরিচরণ।

সারারাত গাড়ী চললো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। ভোর বেলায় সবাই যখন ষ্টেশনে পৌছলেন, তখন প্রত্যেকের চেহারাই হয়ে উঠেছে ধূলি ধূসরিত। অনেক কষ্টে ধুলো ঝেড়ে স্থানটাকে প্রায়ান্ধকার করে তুললে সকলে। কুলীরা মালপত্র বয়ে নিয়ে এলো প্লাটফর্ম্মে। সেখানে ট্রেণের প্রতীক্ষায় অনেক লোক জড়ো হয়ে ছিল। মালের বহর দেখে সকলের মুখে যেন চাপা হাসি ফুটে উঠল। একজন কৌতূহল দমন করতে না পেরে বিনুর বাবাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, মশায়ের যাওয়া হবে কোথায়। বিনু তার বাবার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। গম্ভীর হয়ে সে উত্তর দিলে শৈল-বিহারে। বিনুর উত্তর শুনে ভদ্রলোক একটু হেসে বিনুর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার সাহস দেখে অবাক্ হয়ে যাই মশায়। মানুষ উঠতে পারে না গাড়ীতে এমনি ভিড় আজকাল, আর আপনি নিয়ে চলেছেন একটা সংসার, সঙ্গে যেন একটী সৈন্য-বাহিনীর রসদ সম্ভার। বলি এ ট্রেণে গিয়েছেন কখনো কোথায়? এঅবস্থায় আপনার শৈল-বিহারের সখ চাপলো কি করে?

বিনুর বাবা একটু হেসে বিনুকে দেখিয়ে বললেন,

আমার নয়, এই শ্রীমানের। তবে সখ যখন চেপেছে, আর বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, তখন যেতেই হবে একরকম করে।

ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনুন আর মালগুলো লগেজ করে ফেলুন। পাকিস্থানের ভেতর দিয়ে এসব মাল নিয়ে যেতে পারবেন না। কাষ্টমে আটকে রাখবে সব জায়গায়।

বিন্নুর বাবা ষ্টেশনের ভেতর ঢুকে সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়াটা জেনে নিলেন, তারপর পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বের করে মিশ্রগুণ সুরু করে দিলেন। অঙ্কের ফলটা দেখে তিনি একটু হতাশ হয়ে পড়লেন। বুকিং ক্লার্ক তাঁকে জানালেন, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনলেও তাঁকে যেতে হবে থার্ড ক্লাসে। কেন না সেকেণ্ড ক্লাসের কোন ব্যবস্থা নেই আপাততঃ এই লাইনে। বিন্নুর বাবা অনেক ভেবে চিন্তে থার্ড ক্লাসেরই টিকিট সব কিনে ফেললেন।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী এলো ষ্টেশনে। দূর থেকে তার ভিড়ের বহর দেখে সকলের মুখ গেল শুকিয়ে। গাড়ীতে যত লোক, প্রায় তত লোক বসে রয়েছে ছাদে। হাণ্ডেল ধরে ঝুলছে অগণিত লোক। এমন কি দুটো গাড়ীর মাঝখানেও লোক ঝুলতে ঝুলতে আসছে। বিন্নুর মনে পড়লো, তাদের বাড়ীর সামনের একটা বট গাছে অসংখ্য বাদুড় ঝুলে থাকতো। কিন্তু এ যে তার চেয়েও ভীষণ। মানুষগুলো এমনিভাবে গাড়ী ধরে ঝুলে চলেছে যে, সমস্ত

গাড়ীটাই যেন চাপা পড়ে গেছে তাদের দৈহিক আচ্ছাদনে। বিন্নু সভয়ে গাড়ীর ভেতরে চেয়ে দেখল সেখানে যেন তিল ধারণের স্থান নেই। মানুষের উপর মানুষ এমনিভাবে গাদাগাদি হয়ে রয়েছে যে, চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। দরজা দিয়ে ঢোকা স্বপ্নেরও অতীত ব্যাপার।

আরোহীদের মধ্যে একটা তুমুল সাড়া পড়ে গেল। কেউ উঠতে চাইলো ছাদে, কেউ বা কুলীদের কাঁধে উঠে জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে; কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এলো। সময়ের গতিতে মানুষও হয়েছে হৃদয়হীন। গাড়ীর ভিতরের আরোহীরা আত্মরক্ষার প্রয়াসে প্রাণপণ চেষ্টায় নবাগতদের বাধা দিতে লাগলো। আরোহীদের মধ্যে স্বার্থপরতা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠল। কি সে পৈশাচিক অভিযান! বিন্নু সব দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিন্নুর বাবা ইঞ্জিন থেকে গার্ডের গাড়ী পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করে উঠবার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে আবার ফিরে এলেন। একাই উঠা যায় না, তাছাড়া সদলবলে এই গাড়ীতে চড়া অসম্ভব। গাড়ী আবার ছুটে চললো তেমনিভাবে।

বিন্নুর বাবা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাড়ী ফিরে চল বিন্নু। শৈলবিহার এখন বন্ধ থাক। এর মধ্যে যাবার কোন উপায় নেই।

গাছের নীচে বন-ভোজনের ব্যবস্থা হলো। সবাই মিলে

মহানন্দে বনভোজন করলো। অবশেষে সাব্যস্ত হলো, যে ক'টা জিনিষ সঙ্গে নেওয়া সম্ভব তাই নিতে হবে। বাকীগুলো নিয়ে হরিচরণ ফিরতি গাড়ীতে চলে যাক্।

দিন গেল, রাত গেল। গাড়ীর পর গাড়ী এলো, আবার চলে গেল, কিন্তু কোনটাতেই ভিড়ের কিছু কমতি দেখা গেল না। বিনুর বাবা হতাশ হয়ে বললেন, এখনো তোমাদের শৈল বিহারের সখ মিটলো না। চল বাড়ী ফেরা যাক। কিন্তু এখন ফেরাও মুস্কিল। হরিচরণ অর্দ্ধেক জিনিষ নিয়ে গরুর গাড়ীতে চলে গিয়েছে। আবার গাড়ী সংগ্রহ করতে হবে, তবে যাওয়া যাবে। বিনুর বাবা গরুর গাড়ীর খোঁজে বেরোলেন। ভাড়ার দাবী প্রয়োজন বোধে হলো চতুর্গুণ। তিনি ফিরে এলেন।

বিনু বললে, তার চেয়ে গাড়ীতে ওঠারই চেষ্টা করা যাক এবার।

ঘন্টাখানেক পরেই গাড়ী। কুলীদের মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বিনুর বাবা এবার তৈরী হয়ে রইলেন উঠবার একটা প্রচেষ্টা করতেই হবে। গাড়ী এসে থামলো ষ্টেশনে। সৌভাগ্যক্রমে একজন মহিলা নামলেন, চকিতে বিনুর মা দরজা দিয়ে উঠে গেলেন গাড়ীতে। জানলা দিয়ে বিনুর ভাইবোন আর দুচারটে মালও উঠলো; কিন্তু বিনু আর তার বাবার কোন স্থান হলো না গাড়ীতে। গার্ড গাড়ী ছাড়বার সঙ্কেতধ্বনি করলে। ব্যাপার সঙ্গীন

দেখে বিনুর বাবা কুলীদের সাহায্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ ছাদে উঠে পড়লেন। ছাদের লোকগুলো কি ভেবে যেন সদয় হয়ে তাঁকে একরকম হেঁচড়ে টেনে তুলল। বিনু কোন উপায় না দেখে দুই গাড়ীর মাঝখানের একটা নল প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ঝুলে রইল। একটু অসতর্ক হলেই বিপদ! বিনুর বাবা সভয়ে দুর্গা নাম জপ করতে সুরু করে দিলেন। ঝোঁকের মাথায় একটা অসম্ভব কাণ্ড করে ফেলেছেন তিনি। গাড়ীর ছাদ থেকেই তিনি বিনুকে সাবধান করে সাহস দিতে সুরু করে দিলেন। গাড়ীর ছাদের আরোহীরা সমস্বরে 'রামাহো' সঙ্গীত সুরু করে দিল। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, এ যেন তাদের কাছে নূতন নয়, এরকম অভিযানে তারা বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। গাড়ী অবশেষে মন্থর গতিতে এসে পরের ষ্টেশনে থামতেই বিনুর বাবা বিনুকে অনেক চেষ্টায় ছাদে তুলে নিলেন।

গাড়ী এসে থামল সীমান্ত ষ্টেশনে। আরোহীরা অনেক নেমে গেল। ভিড় অনেকটা কমে গেল দেখে বিনুর বাবা অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, এখানে এত লোক নামল, মেলাটেলা আছে বোধ হয়।

ছাদের একজন একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে, মেলা নেহি, এখানে কেষ্টম হোগা, বিলকুল মাল দেখেগা। মাল দেখা কেষ্টমটা কি বিনুর বাবা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলেন না। অনেকদিন তিনি এদিকে আসেন

নি। অনেক সময় কেটে গেল। গাড়ী ছাড়ছে না দেখে বিনু ঝুলে পড়ে দেখল, প্লাটফর্ম্মে জিনিষ-পত্র খুলে সব তছনছ করা হচ্ছে। বিনু বলে উঠল, কোথাও বোধহয় খুব বড় চুরি হয়েছে বাবা, পুলিশ সমস্ত জিনিষ তাই তল্লাস করে দেখছে।

এমনি সময় বিনুর ছোট ভাই মনু নীচে থেকে ডেকে উঠল, নীচে নেমে এসো বাবা, পুলিশ এসে জিনিষ-পত্র ধরে টানাটানি করছে।

বিনুর বাবা একটু অবাক হলেন। তাঁর জিনিষ নিয়ে টানাটানি করার কারণ খুঁজে পেলেন না। একজন তাঁকে সান্ত্বনা দিল, "কুছু ভয় নেহি, অব সার্চ্চ হোবে, আপুনি নামিয়ে যান।" ধরাধরি করে সবাই মিলে বিনুর বাবাকে নামিয়ে দিল। ময়লাগাড়ীর কালিগুলো তাঁর গায়ে হাতে জামায় এমনিভাবে লেগে গেল যে, দেখলেই মনে হয় দোলযাত্রার পরের দিন রং-বেরঙেএ মাতামাতি করে তিনি ফিরছেন। বিনুও বাবার সঙ্গেই নেমে এলো।

জিনিষ পত্র সব তল্লাস করা হলো। ভাল ভাল শাড়ী ধুতিগুলো ট্রাঙ্ক থেকে বের করে নিলে তারা। বিছানা-পত্র খুলে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হলো। বিনুর বাবা সমস্ত দেখে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। কাপড়গুলো নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই বিনু বলে উঠল, বাঃ আমার মা আর বাবার কাপড় তোমরা নিয়ে যাচ্ছ কেন?

তাঁদের একজন বলে উঠলেন, এসব কাপড়-চোপড় নিয়ে পাকিস্তানে যাওয়া আইনে নিষেধ। সুতরাং এটা ফেরৎ পাবেন না।

বিনুর বাবা সভয়ে বললেন, "একটা রসিদ পেলে ফিরতি-পথে ফেরৎ নিয়ে যাব।" একথার কোনও উত্তর পেলেন না তিনি। একজন এমনি ভাবে তাঁর দিকে চাইল যে বিনুর বাবা আর তাঁর কথার পুনরুক্তি করতে সাহস পেলেন না।

গাড়ীটা তন্ন তন্ন করে তল্লাস করা হলো। বিনুর বাবা অবাক হয়ে দেখলেন, নূতন কাপড় বেরোতে লাগল নানারকম ভাবে। কারো কোমর থেকে, কারোর বিছানা বা বাক্স থেকে, কেউ বা বুকে জড়িয়ে নিয়েছে সেগুলো। একজন মহিলা জড়সড় হয়ে একটি ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘোমটা দিয়ে বসেছিলেন। একজন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ছোট শিশুকে কেড়ে নিল। বিনুর বাবা ব্যাপার দেখে হায় হায় করে উঠে প্রতিবাদের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন; গাড়ীশুদ্ধ লোকও উঠলো প্রতিবাদ করে। কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ দেখা গেল, যাকে তাঁরা শিশু বলে কল্পনা করেছিলেন, সেটা সত্যিকারের শিশু নয়। কাপড় জড়িয়ে শিশুর মত করে রাখা হয়েছে। দেখে সবাই ছি ছি করতে লাগল। বিনুর বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মশায়, ব্যাপার কি? এমনভাবে কাপড় চুরি করে নিয়ে যাবার কারণ কি? ভদ্রলোক একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,

আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। এরা কেউই কাপড় চুরি করেনি, কাপড় এনেছে কিনে। এরা হচ্ছে স্মাগলার। ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান দুই সরকারেরই ক্ষতি করছে এরা। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে চোরাবাজারে কাপড় বেচে লাভ করাই এদের ব্যবসা। ধরা পড়ে এদের জেলও হয়ে যায়। কিন্তু লাভের কথা ভেবে এরা ব্যবসাটা ছাড়তে চায় না।

বিনুর বাবা বলে উঠলেন, আমি তো চোরাবাজারে কাপড় বেচবো না, তবে আমার কাপড় ওরা নিলে কেন?

ভদ্রলোক বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, আপনি যে কি করবেন তাতো আর আপনার গায়ে লেখা নেই! কাষ্টমের পারমিট্ নিয়ে আসেন নি কেন? আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতেই হয়। শুল্ক দিয়ে কাপড় ফেরৎ নিয়ে যাবেন।

বিনুর বাবা হতাশ হয়ে বললেন, কিন্তু রসিদ তো পেলুম না আমি, রসিদ না থাকলে পরে আমায় কাপড় ফেরৎ দেবে কেন?

ভদ্রলোক একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন। বিনু বলে উঠল, ওকাপড় ওরাই নিয়ে নেবে বাবা।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন, না, সে সম্ভব হবে না। সরকার খুব কড়া হয়েছেন এ বিষয়ে। সমস্ত কাপড়ই হয়ত বাজেয়াপ্ত হয়ে সরকারে জমা হবে। প্রথম প্রথম অবশ্য অনাচার চলেছিল, এখন এটা বন্ধ হয়ে গেছে। সাদা পোষাকে হরদম লোক ঘুরছে শুনেছি এদের কীর্ত্তিকলাপ

দেখবার জন্য। মুস্কিল হয়েছে এই, অনেক নিরীহ লোক নিয়ম কানুন না জেনে অপরাধ করে বসে। তার শাস্তিও পায়। যেমন আপনার বেলায় ঘটলো। চোরাকারবারী আপনি নয় ভেবেই আপনাকে আরেষ্ট করা হলো না।

আরেষ্টের কথা শুনে বিনুর বাবা চুপ করে গেলেন।

গাড়ী হুইসিল দিয়ে উঠল। বিনুর বাবা অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কাপড়গুলো নিয়ে যাক্। গাড়ীর ভেতরে যে একটু আশ্রয় মিলেছে এই যথেষ্ট। ছাদের উপর থেকে গড়িয়ে পড়লে শৈল-বিহার কোথায় যেতো? বিনুকে পাশে রেখে তিনি ট্রাঙ্কটার উপরই চেপে বসলেন।

গাড়ী আবার পাক্ সীমান্তে এসে পৌঁছল। সেখানে চললো আর এক দফা সার্চ্চ। বিনুর বাবা আবার ট্রাঙ্ক বিছানা খুললেন। আবার দু'চারখানা জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত হলো। তিনি চুপ করে রইলেন। হাঙ্গামা সব চুকে গেলে বিনুর বাবা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, মশায় বলতে পারেন এমনি সার্চ্চ আর কয় জায়গায় চলবে?

ভদ্রলোক তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, কোথায় যাবেন আপনি?

বিনু বলে উঠল, দার্জ্জিলিং।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, আরো দু'জায়গায় আপনাকে দুর্ভোগ বইতে হবে, তবে আপনার কাছ থেকে আর বিশেষ

কিছু নেবার মত নেই দেখলুম, সুতরাং বেশী বেগ পেতে হবে না।

বিনুর মা রাগ করে বললেন, এবার এলে ট্রাঙ্ক বিছানা যা আছে, সব ওদের দিয়ে দিয়ো। তাহলে আর দুর্ভোগ মোটেই বইতে হবে না।

সকলে হেসে উঠলেন। গাড়ী এসে আর একটা ষ্টেশনে থামল। বিনু অবাক হয়ে দেখল, গাড়ীতে যেন কাপড়ের দোকান বসে গেছে। এত সার্চের পরেও কাপড় বেরিয়ে পড়ল কোত্থেকে সে ভেবেই ঠিক করতে পারল না। ডবল দামে দেখতে দেখতে সব কাপড় বিক্রি হয়ে গেল গাড়ীর মধ্যেই। যারা কিনলে তারা নাকি আবার আরো বেশী দামে শহরে চোরাবাজারে বেচবে সেগুলো। এরা আবার কাপড়ের অভিযান করবে পরের ট্রেণে। আরোহীদের মুখে মুখে এসব কথা শুনে বিনু ভাবলে এজন্যই গাড়ীতে ভিড় হয় এত বেশী। তাই ছাদেও স্থান পাওয়া যায় না। বাদুড়ের মতো ঝোলায়ও স্থান ধরে না গাড়ীতে।

জংশন ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামল। বিনুর বাবা একটু অপেক্ষা করলেন। আরোহীরা সব নেমে গেলে তিনি ধীরে-সুস্থে নামবেন। কিন্তু তাতে ফল হলো বিপরীত। কুলীর দল গাড়ীতে উঠে ভীড় করে বসলো। জংশন থেকেও অনেক আরোহী গাড়ীতে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। অনেক কষ্টে কুলীর সাহায্যে বিনুর বাবা জিনিষ-

পত্র প্লাট্‌ফর্ম্মে নামিয়ে দিলেন, তারপর জানালা দিয়ে ছেলে মেয়েদেরও নামিয়ে নিলেন। ভিড় ঠেলে বিনুর বাবা মা যখন প্লাট্‌ফর্ম্মে এসে পৌঁছলেন তখন দেখা গেল, বিনুর বাবার পাঞ্জাবী গিয়েছে ছিঁড়ে। কাপড়টাও অনেকখানি ছিঁড়ে গিয়ে ঝুল্‌ছে।

হতাশ হয়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে বিছানার উপর বসে পড়ে তিনি হাঁপাতে সুরু করে দিলেন। কুলীরা জিজ্ঞেস করলে, কৌন প্লাট্‌ফরমে যায়েগা।

বিনু বললে, আমরা যাব দার্জ্জিলিং।

বহুত দেরী আছে বলে কুলীরা সরে পড়ল। একজন চেকার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হাত এগিয়ে তিনি বললেন, "টিকেট।"

বিনুর বাবা পকেটে হাত দিয়ে অবাক্ হয়ে বললেন, "আমার মাণিব্যাগ!" দেখা গেল উপরের পকেটের সেপ্‌টি পিনটি খুলে কে যেন মাণিব্যাগটি বের করে নিয়েছে। মাণিব্যাগটির ভিতরে টাকা পয়সা টিকিট সব ছিল। সবার মুখ গেল শুকিয়ে। চেকার মুখ টিপে একটু হাসলেন। বিনুর বাবা সভয়ে বললেন,' মাণিব্যাগটি কে যেন চুরি করে নিয়েছে। টিকিট তার ভেতরেই ছিল।

চেকার পকেট থেকে একখানা খাতা বের করলেন। তারপর হিসেব করে বললেন, একুশ টাকা চার আনা লাগবে, দিয়ে দিন; আর এখান থেকে অপর টিকিট করে নিতে হবে।

কি বিপদ! বিন্নুর মা রাগ করে বললেন, কেমন বে-হিসাবী লোক তুমি বলতো? এখন ছেলে মেয়ে নিয়ে কি করি আমি। টাকা পয়সা না থাকলে ফিরেই বা যাব কি করে? টিকিটের টাকাই বা দেবে কি করে?

বিন্নুর বাবা শুষ্ক মুখে বললেন সেপ্‌টিপিন্ খুলে মাণি-ব্যাগ চুরি হয়ে যাবে এতো ভাবতে পারিনি। ভটচাজ মশায় কেমন করে শুভ দিন দেখে দিলেন বুঝতে পারিনে। এ যে পদে পদে বিপদ দেখছি। টাকা আমার কাছে আছে, সেজন্য চিন্তা নেই। কিন্তু ম্যাণিব্যাগে শ' দুই টাকা ছিল, গচ্চা গেল, তাছাড়া এতগুলি টিকেট। তার দামও তো কম নয়। বিন্নুর বাবা কোঁচারখুঁট খুলে তিনখানা দশটাকার নোট বের করে চেকারের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, অনর্থক দণ্ড গেল এটাকা, টিকিট আমাদের দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত করাই ছিল।

চেকার সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে একখানা রসিদ বই বের করলেন, তার পর নোট তিন খানা হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিয়ে পকেট থেকে পেন্সিলটা খুঁজতে লাগলেন।

বিন্নু ভাবলে চেকার বোধ হয় ভাড়াটা আর দাবী করবে না বলেই টাকা ফেরৎ দিলে। একটু চেষ্টা করলে হয়ত মাণিব্যাগটার সন্ধানেরও ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু একটু পরেই তার সে ভুল ভাঙ্গল। চেকার বলে উঠলেন, আপনার এ নোট চলবে না, পাকিস্থানের নোট চাই।

বিনুর বাবা একটু বিব্রত হয়ে উঠলেন। পাকিস্থানে নোট তিনি পাবেন কোথায়। এ নোট যদি না চলে এখানে তাহলে এটাতো কাগজের সামিল। সপরিবারে জেলে যেতে হবে নাকি তাঁর শেষকালে। ভয়ে তাঁর মুখ গেল শুকিয়ে। চেকার তাড়া দিয়ে উঠল, দেরী করলে চলবে না টাকা বের করুন শীগ্‌গির।

ভাল মুস্কিল তো। পাকিস্থানের টাকা এখন তিনি পান কোথায়। অনুনয় করে চেকারকে বললেন তিনি, পাকিস্থানের টাকা আমার কাছে নেই স্যার। চেকার রাগ করে বললেন, সে আমি জানিনে। এমনি গাড়ীতে এসেছেন সবাই বিনা টিকিটে আবার টাকা দিতে চাচ্ছেন না। দেরী করলে পুলিশের হেফাজতে যেতে হবে। পুলিশের নাম শুনে সবাই দমে গেলেন। এখন এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় কি ?

একটা কুলী উপায় বাতলে দিলে। পাকিস্থানের টাকা পাওয়া যাবে একজায়গায় হিন্দুস্থানের টাকার বদলে, তবে টাকায় চার আনা বাটা দিতে হবে। বিনুর বাবা তখনই কুলীকে সঙ্গে করে চললেন। বাটা দিয়ে যাট টাকা সংগ্রহ করে আনলেন। যাক পুলিশের হাত এড়ানো গেল তো। সব হাঙ্গামা চুকিয়ে তিনি এক কাপ চা খেতে লাগলেন। চা নয়ত, বিষ। কি বিশ্রী স্বাদ তার। আর এখানে তাঁকে ভাল চা দিচ্ছে কে ? কোন রকমে সেটা গলাধঃকরণ করে ফেললেন।

দার্জ্জিলিং মেল এসে গেল। গাড়ীতে খুব ভিড় নাই দেখে হৃষ্টচিত্তে বিনুর বাবা সদল বলে উঠে পড়লেন। একটা সুটকেশ বাদে অন্যান্য জিনিষগুলো কুলীরা তুলে দিল। কুলীরা প্লাট্‌ফর্ম্ম থেকে বকশিশ দাবী করে বসলে। বিনুর বাবা বললেন, কত দিতে হবে।

কুলীরা অম্লান বদনে বললে, আমরা চারজন আছি, আট টাকা!

বিনুর বাবা আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, সে কি? দুজন তো মাল নামালে, আর একজন তুলে দিলে এ গাড়ীতে। আমি তুলে নিলুম মালগুলো। চারজন হলো কি করে?

কুলীর দল হট্টগোল সুরু করে বলে উঠল, রূপেয়া নিকালো, আট রূপেয়া। বিনুর বাবা টাকা বের করতে করতে একটা কুলীর হাতে সুটকেশটা দেখে বলে উঠলেন, আরে সুটকেশটা আবার হাতে রেখেছিস কেন, তুলে দে।

কুলীটা মাথা নেড়ে বললে, আগাড়ী রুপেয়া নিকালো। একজন রেলের লোক গাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বিনুর বাবা তাকে ডেকে বললেন মশায় এ কুলীদের চার্জ্জ কত? তিনি কোন জবাব না দিয়েই চলে গেলেন।

গাড়ী দুই মিনিট পরে ছেড়ে দিল। অগত্যা আটটি টাকা কুলীদের হাতে দিয়ে দিলেন তিনি। কুলীরা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে নিল, কিন্তু সুটকেশটা আর ফেরৎ দিলে না। গাড়ী প্লাট্‌ফরম ছেড়ে

গেল। বিনুর বাবার চেচামেচি সব বৃথা হলো। একজন পরামর্শ দিলেন, চেন টানুন, সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন বললেন, গাড়ী থামতে থামতে কুলীটা পালিয়ে যাবে। নম্বর দেখেছেন ?

বিনুর বাবা অত্যন্ত বিরক্তিভরে বললেন, আচ্ছা ডাকাত এই কুলীগুলো, জুলুম করে নিলে আট আনার জায়গায় আট টাকা, অথচ সুটকেশটা ফেরৎ দিলে না।

বিনুর মা রাগ করে বললেন, ঐ তো তোমার দোষ। টাকাতো দিলেই শেষে একটু আগে দিলে সুটকেশটা হারাতে হতো না। দুশো টাকার জিনিষ রয়েছে ওতে। এটাও গেল।

বিনুর বাবা হতাশ হয়ে বললেন, যাক সব, দেখি শেষ অবধি পাহাড়ে গিয়ে কি পৌঁছয় ? আজকালকার দিনে কি শৈল-বিহার সকলের সহ্য হয় ? পেছন থেকে বাধাগুলো যেন সব টেনে ধরে রাখছে। এক-একটা জিনিষ তাই খসে যাচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত যেতে পারবো কিনা কে জানে ?

গাড়ী এসে থামল আবার সীমান্ত ষ্টেশনে। আবার সেই সার্চ্চের পুনরভিনয় চলল। বিনুর বাবা আবার বাক্স পেটরা খুলে বলে উঠলেন, যা এনেছিলুম সঙ্গে করে তার প্রায় তিন ভাগ গেছে, একভাগ আছে। এগুলোও ইচ্ছে করলে নিতে পারেন। জিনিষ পত্রের ভেতর অল্প কিছু জিনিষই দিয়ে দিতে হলো। বিছানা বাঁধা ছিল পাটের

দড়ি দিয়ে, সেটা তারা খুলে নিলেন। বিছানাগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে রইল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর গাড়ী ছাড়লো।

বিনুরা সবাই গরম পোষাক পরে ছিল। বিনুর বাবাও গরম কোট আবার ওভার কোট চাপিয়ে বসেছিলেন। তাই দেখে একজন ঠাট্টা করে বলে উঠল, মশায়রা কি সবাই নিমোনিয়ার রোগী নাকি? এই গরমের দিনে চাপিয়েছেন তুন্দ্রা অঞ্চলের জামা। বিনুর বাবা উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, সাধে কি এসব চাপিয়েছি মশায়? জিনিষ-পত্র সার্চ্চ করতে করতে ট্রাঙ্ক দুটোই হয়ে গেছে খালি। দেখলেন না দড়িটা পর্য্যন্ত নিয়ে গেল এরা। এই কোটগুলো যদি নিয়ে যেত এখন, তাহলে শীতে দার্জ্জিলিংএ নিমোনিয়াই ধরতো। বাধ্য হয়েই গায়ে চড়িয়েছি এগুলো। মশাই ঘেমে যাচ্ছি সবাই। দেখছেন না ছেলেপেলেগুলো যেন ঘেমে স্নান করছে। উপায় কি? শ্রীমান্ বিনু জুগিয়ে দিল এই বুদ্ধি, ভাবলুম এইটেই ভাল।

একজন হেসে বললেন, আর চিন্তা নেই। ফাঁড়া এবার কেটেছে।

বিনুর বাবা মাথা নেড়ে বললেন, না মশায়, আবার নাকি কোথায় সার্চ্চ হবে। শেষ ঘাঁটি পর্য্যন্ত এই ভালুক সেজেই চলবো।

সবাই হাসতে লাগলেন। বিনুর বাবা বিছানা আর

ট্রাঙ্ক দুটো খুলেই রাখলেন। কিন্তু আর সার্চ্চ হলো না, সে গাড়ীতে।

শিলিগুড়ি পৌঁছে দার্জ্জিলিং লাইনের গাড়ীতে উঠে পড়লেন তিনি। গরম কাপড় চোপড় আবার বাক্সে বন্ধ করে একটা রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফেললেন। ছেলে মেয়েদের একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে বললেন, গাড়ী ছাড়বার অনেক দেরী আছে। বিছানা বাঁধার একটা দড়ি কিনে নিয়ে আসি।

বিনুর মা বার বার সাবধান করে দিলেন, দেখো দড়ি খুঁজতে গিয়ে গাড়ী ফেল করে বসোনা যেন। বিনুর বাবা একটু হেসে প্লাট্‌ফর্ম্মের বাইরে দড়ি কিনতে চলে গেলেন।

গাড়ী যখন ছাড়ে ছাড়ে তখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি। এক হাতে সন্দেশের হাড়ী আর এক হাতে নারকেলের দড়ির বোঝা। সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাঁকে না আসতে দেখে। ছেলেমেয়েরা সন্দেশের হাড়ী দেখে ঝুঁকে পড়ল। বিনুর মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, আর একটু হলে গাড়ী ফেল করতে। বিনুর বাবা হেসে বললেন, দৌড়ে গাড়ী ধরতুম। এ গাড়ী খুব জোরে যায় না। তাছাড়া মোটর সার্ভিস আছে শুনলুম। ট্রেণের অর্দ্ধেক সময় লাগে তাতে। ফেরবার সময় মোটরেই ফিরবো ভাবছি।

গাড়ী যখন চলতে সুরু করে দিয়েছে, তখন বিনু বললে বাবা কমলা কিনে নাও, খেতে খেতে যাওয়া যাবে।

কমলাওয়ালাও সুযোগ বুঝে বেশী দাম আদায় করে নিলে। বিনুর মা বললেন, আমাদের দু আনায় একজোড়া দিতে চেয়েছিল, তুমি কিনলে চার আনা করে, সময় বুঝে না কিনে তুমি চিরকালই এমনি ঠকে আসছ। বিনুর বাবা চোখ বুজে বলে উঠলেন, শৈলবিহারে এমনি বিপত্তিই ঘটে আজকাল।

পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথে গাড়ী ছুটে চললো। দুধারের বনানী অতিক্রম করে গাড়ী উঠছে পাহাড়ে। চারিদিকের মনোরম সৌন্দর্য্য সূর্য্যালোকে যেন একটা অপরূপ ভাব প্রকাশ করছিল। দূরে বিলীয়মান সাগরের ঢেউয়ের মতো পাহাড়ের চূড়াগুলো দেখে বিনুরা সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। নগাধিরাজ যেন প্রশান্ত বদনে সকলের ব্যথায় শান্তির প্রলেপ দিয়ে সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের কোলে আশ্রয় দিচ্ছেন। প্রকৃতির সেই অপরূপ রূপের মধ্যে আত্মনিবেশ করে বিনুর বাবা ভুলে গেলেন তাঁর হৃত সুটকেশ আর ম্যানিব্যাগের কথা। পথশ্রম সার্থক হয়ে উঠল যেন এই নূতন পরিবেশে। আঁকা-বাঁকা পথে সরীসৃপ গতিতে গাড়ীখানা পাহাড় বেয়ে চলল প্রকৃতির মধুর আবেষ্টনের ভেতর দিয়ে। নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সবাই। আনন্দের উচ্ছ্বসিত কলরোল আর

অজস্র প্রশ্নবাণ যুগপৎভাবে ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে আসতে লাগল।

গাড়ী এসে থামল মাঝের একটা বড় ষ্টেশনে। একজন চেকার এসে উঠলেন সেই গাড়ীতে। টিকিট চেক করা শেষ হলে জিনিষপত্র দেখে তিনি বলে উঠলেন, এগুলোর ওজন নিতে হবে। কুলীরা মাল বয়ে নিয়ে এলো ষ্টেশনে। মাল ওজন করে চেকার বললেন, ওজন বেশী হয়ে গিয়েছে। মাশুল দিতে হবে।

টাকা বের করুন বলে চেকার অন্য মাল ওজনে মনোনিবেশ করলেন।

বিনু ইত্যবসরে বলে উঠল, টাকা তুমি দিও না বাবা, আমি ব্যবস্থা করছি।

ট্রাঙ্ক দুটো সে খুলে ফেলল। গরম জামাগুলো সব ভাই বোনদের গায়ে চড়িয়ে দিল। নিজের পোষাকটাও পরে ফেলল সে, তারপর কোট আর ওভার কোটটা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, নাও এটা গায়ে দিয়ে দাও, মায়ের কোট সোয়েটারও দিয়ে আসছি আমি।

বিনু আবার ফিরে এলো। চেকার এই সময় জিজ্ঞেস করলে, কৈ টাকা দিন।

বিনু গম্ভীর হয়ে বললে, মাল ওজন করুন আবার, ওজন কত হয়েছে দেখি।

চেকার বিরক্ত হয়ে বললেন, এইত ওজন করা হলো একবার, কতবার আর ওজন করা হবে ?

ষ্টেশন মাষ্টার এই সময় এদিকে আসছিলেন, বিনু নিয়ে এলো তাকে, স্যার আমাদের মালগুলো ওজন হওয়া দরকার।

চেকার জানালেন, মাল একবার ওজন করা হয়েছে।

বিনু দৃঢ়স্বরে বললে, ওজনে ভুল আছে নিশ্চয়, আবার দেখা দরকার।

ষ্টেশন মাষ্টারের আদেশে জিনিষ পত্রের ওজন নেওয়া হলো আবার। দেখা গেল আগের চাইতে অনেক কম ওজন হয়েছে। এখন আর অতিরিক্ত মাশুল লাগবে না। চেকার আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, এ কি করে হলো ? মাল তো আমি নিজেই ওজন করেছি। বিনু হাসতে হাসতে বললে, সে কথা ঠিক। আমাদের জামাগুলো তখন ঐ বাক্সের ভেতর ছিল। এখন শীত পড়েছে তাই জামাগুলো গায়ে দিয়েছি আমরা। আর আমাদের জন্য টিকিটতো করা হয়েছেই, কাজেই ঐ টিকিটেই কোটের মাশুল দিয়ে দিয়েছি আমরা।

বিনুর বুদ্ধি দেখে সবাই হাসতে লাগলেন। ষ্টেশন মাষ্টার পিঠ চাপড়ে বললেন, ঠিক আছে, তবে আগে থেকেই যদি জামা গায়ে দিয়ে থাকতে, তাহলে এই অসুবিধা আর হতো না। বিনু একটু হেসে বললে, তখন যে শীত পড়েনি স্যার।

দার্জিলিং ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই বিন্নুর বাবা চিন্তিত হয়ে বলে উঠলেন, এখন কোথায় ওঠা যায়? কোথায় হোটেল আছে তাও জানিনে।

বিন্নু ভরসা দিলে, কোন চিন্তা নেই বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে এখন।

কুলীরা মালপত্র প্লাটফরমে নামিয়ে রাখতেই হোটেল ওয়ালার দালালরা বিন্নুর বাবাকে ঘিরে দাঁড়াল। অকূলে আশ্রয় পেয়ে তিনি প্রায় সবাইকেই তার হোটেলে যাবেন বলে কথা দিয়ে ফেললেন। এখন মুস্কিল দাঁড়ালো এই যে, কেউ তার দাবী ছাড়তে চান না। বিন্নু এগিয়ে এসে বললে, আচ্ছা আমি এর ব্যবস্থা করছি। আপনারা একটু চুপ করুন। বলুনতো আপনাদের হোটেলের নাম। সকলে কৌতূহলী হয়ে নাম বলে দিলে তাকে। ছোট ছোট টুকরো কাগজে নামগুলো লিখে ফেলল বিন্নু। তারপর গম্ভীর হয়ে ডাকলো "মন্নু এ দিকে আয়"। মন্নু এসে দাঁড়ালো বিন্নুর কাছে। 'চোখ বুজে থাক' মন্নু চোখ বুজলো। বিন্নু পকেট থেকে রুমাল বের করে নিয়ে তার চোখ দুটো বেঁধে দিলে। তারপর কাগজগুলো বলের মতো পাকিয়ে বলে উঠলো, আপনারা কেউ এগিয়ে এসে কাগজগুলো হাতে রাখুন। একজন কাগজগুলো হাতে নিলেন।

মন্নু একটা কাগজ তুলে নিলো। ভাঁজ খুলে দেখা

গেল স্যানাটোরিয়ামের নাম উঠেছে। মনু চোখ খুলে ফেলল। বিনু হাসতে হাসতে বললে, কেমন আপনাদের আর আপত্তি নেইতো। আমরা স্যানাটোরিয়ামেই যাবো।

অপূর্ব্ব সমাধান দেখে সবাই খুশী মনে চলে গেল।

সবাই স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে উঠলেন। এক সপ্তাহের চার্জ্জ দিতেই বিনুর বাবার টাকাগুলো গেল ফুরিয়ে। মহা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন তিনি। টাকা না হলে ফিরে যাবার কোন পথ হবে না। বাড়ী থেকে লিখে টাকা আনাতে অনেক সময় লাগবে। এখন কি করা যায়।

সমস্যার সমাধান করলেন বিনুর মা। গলা থেকে দামী সোনার হার খুলে দিয়ে বললেন, এইটে বিক্রী করে খরচ চালাও এখন। বাড়ী গিয়ে নূতন প্যাটার্ণের একটা তৈরী করে নিলেই হবে।

কদিন এ-পাহাড় ও-পাহাড় ছুটাছুটি করে বেড়ালো সবাই। বিনু দস্তুরমতো মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা সুরু করে দিলে। মনুতো হেসেই আকুল। মেঘ সব নীচু পাহাড়ে জমায়েত হয়ে আছে। শৈলশিখরে বসে তারা সে আনন্দ বিশেষভাবেই উপভোগ করল। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তুষার-কিরীট অন্যান্য শৃঙ্গগুলি যখন রৌদ্রালোকে চিক্‌চিক্ করে উঠত বিনুদের মন তখন আনন্দে নেচে উঠতো। কি সুন্দর এই পাহাড়ের দৃশ্যগুলো। যত দেখা যায় ততই যেন ভালো লাগে। বিনু একদিন

প্রস্তাব করে বসলে, চলো বাবা টাইগারহিলে যেয়ে সূর্য্যোদয় দেখে আসি।

স্যানাটোরিয়ামের এক ভদ্রলোক বললেন, আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্য্যোদয় ভালই দেখা যায়, তবে এখন সে আশা খুব কম। মেঘে ঢাকা থাকলে কিছুই দেখা যাবে না।

পরের দিন মোটরে সবাই রওনা হলেন টাইগার হিলের দিকে। খানিকটা পথ হেঁটে অতিকষ্টে তারা একটা বাংলোয় গিয়ে উঠলেন। সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে শীত চেপে এলো। যে জামা কাপড় বিছানা তারা নিয়ে গিয়েছিলেন তাতে শীত কাটানো অসম্ভব মনে হলো।

সকলে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। শেষ রাত্রের দিকে শীতের প্রকোপে বিন্নুরা অস্থির হয়ে উঠল। হঠাৎ বিন্নু একটা মতলব ঠিক করে লেপ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মন্নুকে ডেকে বললে, মন্নু উঠে আয়। আমরা যুদ্ধ করি তাহলে শীত কমে যাবে। মন্নু বললে বেশ! বিন্নু গম্ভীর হয়ে বললে, দেখ তুই হচ্ছিস গোবর আর আমি গামা। দেখব তুজনের মধ্যে কে বেশী জোয়ান। কুস্তি লড়বি আয়।

তুজনে কুস্তি সুরু হলো। কুস্তির চেয়ে কুস্তির পাঁয়-তাড়াই বেশী। সকলে জড়সড় হয়ে তুজনার কুস্তি দেখতে লাগলেন। অন্যমনস্কতার ফলে শীতটা কেউ বেশী অনুভব

করলো না। কুস্তি চলতেই লাগল, এই সুযোগে ভোরের আলো ঢুকে পড়ল বাংলোর ভেতর। বিনু বললে, এখন ইণ্টারভ্যাল। সূর্য্য উঠা দেখে আসি চল।

সকলে সূর্য্যোদয় দেখবার জন্য বাইরে এলো। সূর্য্য আস্তে আস্তে উঠতে লাগলো আকাশে। সমস্ত আকাশটায় কে যেন আবীর ছটা দিয়ে রাঙিয়ে তুলেছে। চারিদিকের তুষারময় পরিবেষ্টনে সে দৃশ্য অতি মনোরম। লাল থালার মতো সূর্য্য উঠতে লাগলেন আকাশে। যেন পাতাল থেকে সূর্য্যদেবের মর্ত্ত্যে আগমন হচ্ছে। নবোদিত সূর্য্যের অরুণ কিরণে সমস্ত পাহাড়টায় অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছিল। সবাই সেই সৌন্দর্য্যচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে শ্রদ্ধাপ্লুত মনে প্রকৃতি দেবীর বন্দনা করল। বেশীক্ষণ এই দৃশ্য দেখা গেল না। রাহু গ্রাসের মতো মেঘ এসে ঘিরে ফেলল তাকে। তবু যেটুকু তারা দেখতে পেয়েছে তাই যথেষ্ট। সারা রাত্রির শীতের কষ্ট তাদের মনেই রইলো না।

বিনুদের শৈল বিহার প্রায় শেষ হয়ে এলো। বিনুর বাবা বললেন, পরশুই রওনা দিচ্ছি আমরা। যাবার পথে ভারত ডোমিনিয়নের দিকেই যাব। পথ একটু বেশী হবে, তাতে ক্ষতি নেই। কাষ্টম আর কুলীর হাত থেকে তো বাঁচা যাবে।

বিনু প্রস্তাব করলে কাল জলাপাহাড়ে যাওয়া যাক্ বাবা।

তাই ঠিক হলো। পরের দিন দুপুরবেলা জলাপাহাড়ের পথ ধরলেন সবাই। সারা দুপুর ঘুরে ফিরে সন্ধ্যার একটু আগেই ফিরতে লাগলেন তারা। বিনুর বাবা চলছিলেন সবার আগে। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল "তেরি ভালা হোগা।" বিনুর বাবা চমকে উঠে পিছনে চাইলেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে এক জটাজূটধারী সাধু বসে রয়েছে, সারা গায়ে তার ছাই মাখা। তার উপর ভুটিয়া কম্বল চাপানো। হাতে চিমটা। যাবার সময় এ সাধুকে তাঁরা দেখেন নি। যে জায়গাটা দখল করে বসেছে, সেটা কোন সাধুর আস্তানা বলে মনে হলো না। বিনুর মনে হলো সাধু বোধ হয় পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এখানে বসে পড়েছেন।

বিনুর বাবা সাধুর খুব ভক্ত। সাধু দেখলেই তিনি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়েন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সাধু হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলো, জিতা রহো বেটা। তারপর বিনুর বাবার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলো, তোমার সময় তো খুব খারাপ যাচ্ছে। বিনুর বাবা সখেদে বলে উঠলেন, সে আর বলতে? এই পাহাড়ে আসতেই সব খোয়া গেছে। ভাগ্যিস্ কিছু গয়না ছিল, তাই রক্ষে।

সাধু বিড় বিড় করে কি বললে, তারপর পাহাড়ে রাস্তায় আঁক কষলে দু একটা। পরে গম্ভীর হয়ে বললে, সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে টাকা পয়সা কি আছে

রেখে দে, এই আঁকটার উপর। আমি মন্ত্র পড়ে দিই, সব টাকা ফিরে আসবে আবার।

বিনুর বাবা কোঁচার খুট খুলে টাকা বের করতে লাগলেন, বিনুর মা তার গয়নাগুলো খুলে দিলেন। এতগুলো গয়না আর টাকা দেখে সাধুর মুখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল। আনন্দে উৎসাহে সে সজোরে মাথা নেড়ে বললে, বাস সব ঠিক করে দিচ্ছি।

বিনুর যেন কিছুই ভাল লাগছিল না। সরল বিশ্বাসের ফলে তার বাবা প্রতিপদেই ঠকে আসছেন। এই সাধুটা টাকা আর পয়সাগুলো নিয়ে চম্পট দিলেই মুস্কিল। তার বাবা সাধু সন্ন্যাসীর যা ভক্ত! কত সাধু তাকে ঠকিয়ে টাকা পয়সা নিয়েছে, এ তার জানা আছে। তাই এই সাধুকে সে প্রথম থেকেই প্রীতির চক্ষে দেখছিল না।

সাধুর প্রবল বেগে মাথা নাড়াটা সে লক্ষ্য করেছিল। সবিস্ময়ে সে দেখলে, সাধুর মাথার জটটা একদিকে যেন একটু সরে গেল। সাধু সেটা চকিতে ঠিক করে নিলে বটে, কিন্তু বিনুর চোখ তাতে এড়ানো গেল না। ভক্তির আতিশয্যে বিনুর বাবার লক্ষ্য সেদিকে গেল না। তিনি গয়না আর টাকাকড়ি সব সাধুর সম্মুখে রেখে দেবার জন্য অগ্রসর হলেন। সাধুর দৃষ্টি গহনা ও টাকার উপর যেন গিয়ে বসল। বিনু এই অবসরে সাধুর পিছনে গিয়ে জটা ধরে এক হেচকা টান দিল।

আচমকা টানে আলগা জটা খুলে গেল। অতর্কিত

আক্রমণে সাধু হক্‌চকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিনু এই সময়ে সহসা এক ধাক্কা দিল। ধাক্কায় সাধু গড়িয়ে খানিকটা নীচে নেমে গেল। তার কোমর থেকে একটা ছোরা পড়ে গেল রাস্তার মধ্যে। বিনু চকিতে সেটা কুড়িয়ে এনে তার বাবার হাতে দিল।

বিনুর বাবা বিনুর এই ব্যবহার দেখে চীৎকার করে উঠেছিলেন। পরে সাধুর স্বরূপ বুঝে তাড়াতাড়ি ছোরাখানা হাতে নিয়ে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাধু চিমটে নিয়ে তাদের তাড়া করলে। বিনু মনু দূর থেকে ঢিল ছুড়তে স্থরু করে দিল। সকলে মিলে চেঁচামেচি স্থরু করে দিলেন।

তিনজন সেনানী এই সময় রাস্তা দিয়ে ফিরছিল। চীৎকার শুনে তারা এগিয়ে এসে সাধুটিকে ধরে ফেলে উত্তম মধ্যম প্রহার করতে লাগলো। অবশেষে তার পরিচয় প্রকাশ পেলো। এক দাগী আসামী সে।

বিনুর বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আর দেরী নয়। আজই রওনা হতে হবে মোটরে। ভাগ্যিস্ বিনু ছিল, তাই যাবার একটা উপায় হলো। নইলে কি মুস্কিল যে হ্তো!

বিনু জিজ্ঞেস করলে, আবার আসবে তো বাবা আসছে বছরে এখানে। বিনুর বাবা সোৎসাহে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়, তবে তোমাকেও আসতে হবে আমাদের সঙ্গে। নইলে ফিরে যাবার উপায় থাকবে না।

বিনু হেসে উঠল।

অলক-পুলক যমজ ভাই। চেহারা হুবহু একরকম। দুজনের কে যে অলক আর কে পুলক নিজেরা না জানালে বাইরের কারো ধরবার সাধ্যি নেই। একই সিটের প্যাণ্ট আর সার্ট কোট ইত্যাদি তারা পরতো। এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের ফলে তাদের চিনতে অনেককেই অসুবিধায় পড়তে হতো। এমন কি তাদের বাবা মা পর্য্যন্ত অনেক সময়ে ভুল করে বসতেন।

লেখাপড়া খেলাধূলায় দুজনেই স্কুলের খুব ভাল ছাত্র। দুষ্টুও তেমনি ওরা। তবে একের অপরাধের শাস্তি আর একজনকে বইতে হতো প্রায়ই। অম্লান বদনে মেনে নিতো দুজন। তবে মাঝে মাঝে এমনি হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো যে, অপরাধের লঘুদণ্ডই তাদের হতো। অনেক সময় আবার একজনের দুষ্টুমির ফল দুজনাকেই ভোগ করতে হতো।

ইতিহাসের শিক্ষক রমেশবাবু শিবাজীর কাহিনী বর্ণনা করে চলেছিলেন। অলক পুলক দুজনে একটু অন্য-মনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করে বসলেন, বলতো পুলক, পার্ব্বত্য মুষিক কাকে বলা হতো।

পুলক বলে উঠল, গিনি পিগ স্যার। রমেশবাবু ছুটে এলেন। পুলক ততক্ষণ বসে পড়েছিল। রমেশবাবু এসে কান মলে দিলেন অলকের। অলক বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, বাঃ আমি কি করলুম।

রমেশবাবু মুখ খিঁচিয়ে বললেন, ঠাট্টা হচ্ছে, -নয় ?

অলক বললে, আমি জানি স্যার। আমাকে তো আপনি প্রশ্ন করেন নি।

রমেশবাবু একটু অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠলেন, তোমাদের দুজন কখনো একসঙ্গে বসতে পারবে না।

সমস্ত ক্লাসের ছেলেরা হাসাহাসি করতে লাগল।

পূজার ছুটির আগে স্কুলে নাটক অভিনীত হবে। সিরাজের কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছেন রমেশবাবু নিজে। কিন্তু সিরাজের পাঠ নেবে কে? কাউকেই রমেশবাবুর পছন্দ হয় না। নাটকটার প্রথমাংশ কোমলতায় ও শেষাংশ করুণ কাহিনীতে রচিত। এই কোমলতায় কাঠিন্যে গঠিত সিরাজের পার্ট স্কুলের কোন ছাত্রই সম্যকভাবে পরিস্ফুট করতে পারল না। অলক প্রথমাংশ পারলে, কিন্তু শেষাংশ তার হয়ে উঠল হাস্যকর। পুলক শেষাংশ ভাল পারলে কিন্তু প্রথমাংশের গুরুগম্ভীর সুরে কোমলতার চিহ্ন পরিস্ফুট হল না। অবশেষে সকলে মিলে সাব্যস্ত করলেন, অলক অভিনয় করবে প্রথম দিকটা, আর পুলক শেষের অংশ। দুজনের চেহারা যখন একরকম সুতরাং এই অভিনব পন্থা ভালই হবে। বান্ধব নাট্য-সমিতি থেকে সিন, পোষাক প্রভৃতি আনা হলো। স্কুলের সামনের মাঠে রঙ্গমঞ্চ খাটানো হলো। পূজার আনন্দে চারিদিকে একটা

সাড়া পড়ে গেল। স্কুলে রোজই নাটকের মহড়া চলতে লাগল। কলকাতার একজন নৃত্য-শিল্পী এসে ছেলেদের নৃত্যগীত শেখাতে লেগে গেলেন।

চাঁদার খাতা ছাত্র মহলের সীমানা পেরিয়ে টাউনের গণ্যমান্য লোকদের কাছে পৌঁছল। এতো আর দুর্ভিক্ষের চাঁদা নয়, থিয়েটারের টিকিট। সর্ব্বনিম্ন এক টাকা থেকে সর্ব্বোচ্চ দশ টাকার টিকিটগুলো অবধি সব বিক্রী হয়ে গেল।

থিয়েটারের রিহার্সেল যাঁরা দেখলেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, অভিনয়টি ভালোই হবে। বিশেষতঃ সিরাজের অভিনয়টা।

অলক পুলক স্থানে অস্থানে নাটকীয় ভঙ্গিতে পার্ট মুখস্থ করে চলল। অলক বলতে লাগল নাটকের প্রথমাংশ, পুলক শেষাংশ। ফলে কোমলে-কাঠিন্যে জড়াজড়ি করে এক অদ্ভুত রসের অবতারণা হতো।

মা হেসে বললেন, নবাবকে যে তোরা তুলোধোনা করে ছাড়লি। অলক নাটকীয় ভঙ্গিতে বললে, হে মাতঃ আমিনা! সুবা বঙ্গ—"

মা ধমক দিয়ে বললেন, যা পালা এখান থেকে, আমি আমিনা হতে যাব কেন?

অলক দূরে গিয়ে বললে, হে মাতঃ, নবাবেরে কর অপমান, ত্বরা করি আন হেথা কেক্ বিস্কুটের ডালি, নবাবের তরে ভেট, অপমান করিতে স্খালন।

পুলক করুণ সুরে বললে, নবাবী গিয়েছে খসে মোর, ক্ষুধা ক্লান্ত দেহ মোর, ধুঁকিতেছে কেক্ বিস্কুটের তরে,—দেহ মাতঃ—

এমনি সময় দুই ভাই বাবাকে আসতে দেখে ছুটে পালাল। মা চিৎকার করে বললেন, পালাস্নি, কেক্ বিস্কুট নিয়ে যা।

ওদের বাবা হেসে বললেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা কেক্ বিস্কুট খেতেন কি না ইতিহাসে তা লেখে না। কিন্তু তোমার এই নাটুকে-নবাব দুটো পড়া শোনা একদম ছেড়ে দিলে নাকি ?

অলক পুলককে চুপি চুপি বললে, বাবাকে মহম্মদী বেগের পার্টটা দিলে হয় না ?

পুলক হেসে বললে, দূর বাবা শুনলে আস্ত রাখবে না।

থিয়েটারের দিনে বিপুল জনসমাগম হলো। টাকাও আদায় হয়েছে অনেক। থিয়েটার শেষ হলে উদ্বৃত্ত টাকাগুলো বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হবে। সবার মুখে একই কথা, ছেলেরা নাকি এক অপূর্ব্ব অভিনয় করবে। কোলের শিশু থেকে অতি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এসেছেন ছেলেদের এই অভিনয় দেখতে। জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সরকারী কর্ম্মচারীরা উৎসাহিত হয়ে ছেলেদের এই অভিনয় যাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

প্রথম দৃশ্যে শিশু সিরাজউদ্দৌলা কৌতুকচ্ছলে নবাব আলিবর্দ্দীকে বন্দী করে ফেলেছেন। অলক অত্যন্ত চমৎকার করে দৃশ্যটির অবতারণা করলো। আলীবর্দ্দী খাঁকে লক্ষ টাকা গুণে দিয়ে বের হতে হলো। একতাড়া নোট। উপরে দশটাকার আর নীচে দশটাকার দুখানা নোটই ছিল তাতে। ভিতরে বাকী সব সাদা কাগজ। দর্শকদের মধ্যে একজন ঠাট্টা করে বলে উঠলেন, সে সময় নোট ছাপা হলো কি করে ?

অলকের অভিনয় চাতুর্য্যে এটা চাপা পড়ে গেল। নবাব আলীবর্দ্দীকে মুক্ত করে অলক নবাবী কায়দায় কুর্নিশ করলে। দর্শকদের মধ্যে হাততালি পড়ে গেল। ড্রপসিন ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পুলক এসে বললে, লক্ষ টাকা তো পেয়ে গেলি। তুই তো ছোট নবাব, এত টাকা দিয়ে কি করবি। দশটা টাকা দিয়ে দে তো, বড় নবাবের দরকার। বাইরে চপের যা খোশ বো বেরুচ্ছে, গোটাকয়েক মুখে দিয়ে আসি।

অলক বললে, আমি যেতে পারবো না ভাই, আমার পার্ট আছে। পুলক সান্ত্বনা দিয়ে বললে, তারজন্য কোন চিন্তা নেই, তোর জন্যও এনে রেখে দেবো'খন। শেষের দিকটা যখন আমি নবাব হবো, তখন তুই খেয়ে ফেলিস্।

পুলক গিয়ে রেস্তোরায় বসলে। যাঁরা বাইরে গিয়েছিলেন, তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে রইলেন। স্বয়ং নবাবই যখন

বাইরে আহারে ব্যস্ত, তখন যবনিকা উত্তোলনের দেরী আছে নিশ্চয়। নবাব কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে আহার করতে লাগলেন। বাইরের দর্শকরা যখন ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন নবাবের আর একটা দৃশ্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্বয়ং নবাব ইংরাজ সেনাপতিকে সাবধান করে দিচ্ছেন তখন। এ কি করে সম্ভব হলো, তা তাঁরা ভেবেই ঠিক করতে পারলেন না।

পলাশীর রণক্ষেত্র। এবার পুলকের পালা। যুদ্ধ বেধে উঠেছে প্রবল ভাবে। মীরমদন আর মোহনলালের বীরত্ব কাহিনীর কথা ঘন ঘন জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলার শেষ নবাবকে। মীরজাফরের নিশ্চেষ্টতা আর বিশ্বাস ঘাতকতার পরিচয়ও এসে পড়ছে তাঁর কাছে। নবাব নিশ্চল হয়ে রয়েছেন রঙ্গমঞ্চে গভীর চিন্তার অভিনয়ে। অলক পর্দ্দার আড়াল থেকে বলে উঠল, চুপে চুপে বলে দে না ভাই চপের মোড়কটা কোথায়। সবই খেয়ে ফেলেছিস্ নাকি ?

পুলক অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, ডান দিকের তাকের উপর রয়েছে দুটো।

রমেশবাবু নিজেই প্রম্পটার হয়েছিলেন। একথায় তিনি চমকে উঠলেন। পুলক বলে কি ? সব পার্ট ভুলে গেল নাকি শেষে। কি বলতে কি বলছে! ডানদিকের তাকের উপর রয়েছে দুটো, এতো তার অভিনয়ের কথা নয়। জোরে

জোরে তিনি প্রম্পট্ করতে লাগলেন। দর্শকেরা তার প্রম্পটিং শুনে উচ্চ হাস্য করে উঠলেন।

পুলক সামলে নিলে। হাসির বেগ একটু কমে গেলেই সে বলতে স্বরু করে দিলে। হাসে বিশ্ববাসী, হাসে বাংলার জনসাধারণ। কিন্তু চিন্তা নাই, ডান দিকে রয়েছে ত্বটো হে শিশু নবাব! বীর শ্রেষ্ঠ তারা, মীরমদন আর মোহনলাল, দক্ষিণ হস্ত সম-স্বর্ণাক্ষরে—”

পুলক কথায় জাল বুনে চললে, ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। রমেশবাবুর মন উৎকণ্ঠায় ভরে গেল। এসব বলছে কি পুলক। এতো তার বলবার কথা নয়। ডোবাবে দেখছি সব।

রমেশবাবু দাঁত কিড়মিড় করে প্রম্পটিং পুনরাবৃত্তি করলেন। দর্শকেরা নিস্তব্ধ হয়ে শুনছিল। রমেশবাবুর প্রম্পটিং অনুযায়ী আবার অভিনয় স্বরু হলো। মাঝখানের অসঙ্গতি পুলকের অভিনয় চাতুর্য্যে দর্শকদের কাছে চাপা পড়ে গেল।

অলক ডান দিকের তাক থেকে চপ ত্বটো পেড়ে এনে মহানন্দে ভোজন স্বরু করে দিলে। খানিক পরে আবার সকলের অগোচরে পর্দ্দার আড়ালে এসে বললে, পুলক একটা চপ খাবি ?

পুলক তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, আপত্তি নাহি মোর।

নবাবের সঙ্গে মীরজাফরের কথা হচ্ছিল রঙ্গমঞ্চে।

মীরজাফর বার বার মীরমদন আর মোহনলালের দাম্ভিকতার কথা প্রকাশ করে নবাবের বিতৃষ্ণা আনবার প্রচেষ্টা করছিলেন। এখানে আপত্তির কথা উঠে কি করে,। মীরজাফর কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। তার যে পার্ট, একথার পর সেটা বলা চলে না।

অলককে উইংসের একপাশে দেখা গেল চপ হাতে। পুলক চঞ্চল হয়ে বলে উঠল, "দাও মোরে চপ ত্বরা করি।" থিয়েটারের ভেতরে বাইরে সবাই অবাক হয়ে উঠলেন।

পলাশীর রণক্ষেত্রে এই বিপদের মুখে নবাব চপ খাবেন এমন বই রমেশবাবু লিখলেন কি করে? একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো দর্শকদের মধ্যে। রমেশবাবু হস্তলিখিত বইখানা হাতে নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন। একবার ষ্টেজের বাইরে পেলে হয়! মুণ্ডটা ছিঁড়ে দুভাগ করে দেবেন। হতভাগাটা আর দুষ্টুমির জায়গা পেলে না। এতগুলো লোক পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে এসেছে এখানে। চটে গেলে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে?

পার্টের অসঙ্গতির ফলে অন্যান্য অভিনেতা নিশ্চল হয়ে রইল। অলক উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। কে যেন দুষ্টু একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। সহসা সে ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিলো তাকে। পোষাক সুদ্ধ ঢুকে পড়ল অলক ষ্টেজের ভেতর।

একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো রঙ্গমঞ্চে। জ্যান্ত

দুই নবাব এসে পড়েছেন একই ষ্টেজের মধ্যে। একজন শিশু বেশী, একজন যুবক। দর্শকদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। অলক ব্যাপার সঙ্গীন দেখে পুলকের পকেটে চপটা রেখে চট্ করে পালিয়ে গেল। রমেশবাবু যবনিকা ফেলে দেবার আদেশ দিলেন। কিন্তু পুলক গম্ভীর সুরে আবৃত্তি করে উঠল, "হাসে বাংলার নরনারী, নবাবের দুঃখ দেখে, ইংরাজের ছলনার কুহক মায়ায়, হেথা মনশ্চক্ষে ভেসে আসে মোর, সেই শিশু ছবি, চপ যেন ছিল মোর প্রিয়, কোথা সেই আনন্দের খনি এই রণক্ষেত্রে, ষড়যন্ত্র বিভীষিকা—"

যবনিকা আর ফেলা হলো না।

দর্শকের দল চুপ করে গেল। অভিনয়ের পরের ভাগ সে দৃশ্যে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উৎরে গেল। নানারকম ত্রুটী সত্ত্বেও পুলকের অভিনয় চাতুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই পুলকের কান ধরে রমেশ বাবু গ্রীণরুমে নিয়ে গেলেন তাকে। তিরস্কার করে বললেন, চপ খাবার আর জায়গা পেলিনে হতভাগা। মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো। দেখি কত চপ খেতে পারিস তুই। তিনি হন হন করে চপ আনতে বেরিয়ে গেলেন। পুলক ব্যাপার দেখে সরে পড়ল। রমেশবাবু একটা ঠোঙ্গায় কয়েকটা চপ এনে অলককে দিয়ে বললেন, এর পরের সিনে আবার যদি ষ্টেজের মধ্যে চপ চেয়ে বসবি, তখন দেখে নেবো। আর অলকটা হয়েছে এমনি বাঁদর। ষ্টেজের মধ্যে ঢুকে গেল

সটান। এ যেন ইয়ার্কির জায়গা। একবার দেখা পেলে হয়! যত নষ্টের গোড়া ঐটে।

অলক মুচকি হেসে চপ খাওয়া সুরু করলে।

পরের দৃশ্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ছদ্মবেশে পলায়নের কথা। অলকের চপ খাওয়া শেষ না হতেই রমেশবাবু এসে বিরক্তিভরে বললেন,—এখনো চপ গেলা সারা হলোনা? ঘণ্টাখানেক ধরে কি চপই চিবোবি। থাক এখন ওগুলো, এ সিনের পরে খেয়ে ফেলিস। বলে উত্তরের আর অপেক্ষা না করে অলকের নবাবী পোষাক খুলে ফেললেন। একটা ছেঁড়া আচ্‌কান পরিয়ে দিলেন। আচ্‌কানটা একটু বড় হলো অলকের গায়ে। যাক্ তাতে কিছু আটকাবে না। একটা নকল দাড়ি লাগিয়ে দিলেন রমেশবাবু তার মুখে। তারপর মাথায় চড়িয়ে দিলেন কাপড়ের টুপি। একেবারে ভোল বদ্‌লে গেল অলকের। নবাব সিরাজউদ্দৌলা বেমালুম ছদ্মবেশে চাপা পড়ে গেলেন।

অলক প্রহারের ভয়ে আত্মপরিচয় দিতে সাহস পেলে না। রমেশবাবু যা চটে আছেন, পরিচয় দিলেই বিপদ হবে ভয়ানক। যাক্ পুলক তো সহসা ঘেঁসছে না এখন। গত সিনটা চপ নিয়ে যা কাণ্ড করেছে, আর যে পুলক এমুখো হবে তা তার মনে হলোনা। রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা হলে হয়ত অলক ভেবেই পুলককে দু'চার ঘা বসিয়ে দেবেন।

অলক ভাবলে এ সিনের পার্টটাতো তার ভাল করে

জানা নেই, শুধু পুলকের মুখে শুনে শুনেই যেটুকু আয়ত্ত হয়েছে। তা'ছাড়া বেশী কিছু বলতে পারবে না। পুলক যে শেষে চম্পট দেবে এটা জানা থাকলে সে সব পার্টটাই মুখস্থ করে ফেলতো। না-হয় শেষের দিকটা একটু হাস্যকরই হতো। কিন্তু এরকম অবস্থাতো আর হতো না। কিন্তু রমেশবাবুর ভয়ে পুলকটা পালিয়ে গেল কোথায়? এখন সে করবে কি?

অলক একবার ভাবলে আত্ম পরিচয়টা দিয়েই ফেলি। কিন্তু তাতেই যে খুব সুরাহা হবে তা তার মনে হলো না। পুলক পালিয়ে গেছে। সেজন্য সে দু দফা শাস্তি পাবে। আর তার জন্য শাস্তি তো মজুদই রয়েছে। না চুপ করে যাওয়াই ভালো। রমেশবাবুতো সিনের পাশ থেকে সব বলেই দিবেন। একটু ভাল করে শুনে নিয়ে গুছিয়ে বলতে পারলেই বাস্। আর তা ছাড়া তার পার্ট তো ভালই হয়েছে। এ অংশটাও নামাতে তাকে বেশী বেগ পেতে হবে না।

তখনও কন্সার্ট চলছিল। রমেশবাবু তার পার্টের অংশটা ভাল করে দেখে নিতে বললেন। ষ্টেজে গিয়ে যেন আবোল তাবোল বলা না হয় আগের মতো, সেজন্য বারবার সাবধান করে দিলেন। অলক রুদ্ধশ্বাসে পার্টটা বারবার পড়তে লাগল।

কন্সার্ট বাজনা থামল। রমেশবাবু বলে উঠলেন, পুলক

তৈরী থাকো তুমি। ড্রপসিন উঠার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেই ষ্টেজে যেতে হবে প্রথমে। তুমি যেন অতি ক্লান্ত এই ভাব রেখে হাঁটবে। ষ্টেজে খানিকটা ঘোরাঘুরির পর তোমার পার্ট আরম্ভ হবে।

ড্রপসিন উঠল। অত্যন্ত ক্লান্ত পদে অলক ষ্টেজের ভেতর অগ্রসর হতে লাগল। পা দুটো যেন আর চলতে চায় না। অনেক পথ অতিক্রম করে যেন ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছে সে, এমনি একটি ভাব দেখিয়ে অলক ষ্টেজের মধ্যে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল।

ঠিক উইংসের অপর পাশ দিয়ে পুলক ঢুকে পড়ছে খাস নবাবী বেশে। পুলকটা এতক্ষণ কোথায় ছিল, আর হঠাৎ এই নবাবী বেশে ষ্টেজে ঢুকে পড়লো কি জন্যে অলক তা ভেবে ঠিক করতে পারলে না। এ বেশে তার ষ্টেজে ঢোকার কথাতো ছিল না। আর ঢুকেই যদি পড়ল তাহলে পোষাকটার একটা পরিবর্ত্তন করে নিলেই হতো। এর পরে যে পার্ট তাতো এ সাজে করা চলে না। অলক পুলক দুজন সামনা-সামনি পড়ে গেল। চোখের ইঙ্গিতেই পোষাকের ছদ্মবেশ ভেদ করে দুজন পরস্পরকে চিনে ফেলল।

রমেশবাবু প্রমাদ গুণলেন। একি বিপর্য্যয় অবস্থার সুরু হলো এবার! এরা কি নাটকটাই পণ্ড করে দেবে নাকি? দুই ভাই মিলে নাটকটাকে যেন খিঁচুড়ি করে ফেলছে। অলকটা এত পাজী হয়েছে যে তার নির্দ্দেশ

গ্রাহ্য না করেই ষ্টেজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। প্রযোজক সতীশবাবুকে তিনি বলে উঠলেন, “যবনিকা ফেলে দিন সতীশবাবু। পাজী ছেলেটাকে আচ্ছা করে সায়েস্তা করে আসি।” সতীশবাবু দুই নবাবকে বিভিন্ন পোষাকে সামনা সামনি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রাগে রমেশ বাবুর মুখ থেকে কোন কথাই বেরোলো না। আর বলেই বা লাভ কি ?

অলক ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। রমেশবাবুকে নির্ব্বাক দেখে সে তার কর্ম্মপন্থা ঠিক করে ফেলল। সহসা আভূমি নত হয়ে কুর্ণিশ করতে করতে এগিয়ে বলে উঠল, সুবা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি বাংলার শেষ আশ্রয়স্থল নবাব সাহেব! আপনার এই পোষাকে আগমন যে আমার স্বপ্নেরও অতীত জনাব!

সতীশবাবু যবনিকা ফেলতে যাচ্ছিলেন। অলকের ব্যাপার দেখে ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন, এই সময় যবনিকা পতনে দর্শকদের মধ্যে হট্টগোল সুরু হবে নিশ্চয়।

পুলক ব্যাপারটা সম্যক বুঝে বললে, কে তুমি পথিক ? অন্ধকারে আলোকের শিখা জাগিয়ে তুলছ। পথশ্রমে ক্লান্ত সমস্ত দেহ মন আমার পুলকে ভরে আসছে।

অলক আবার কুর্ণিশ করে বললে, অধম দুনিয়ার বান্দা এক দরবেশ মাত্র। চারিদিকে অহঃরহ নবাবের শত্রু ঘুরছে। একটু অসাবধান হলেই আর রক্ষা নেই। মীরজাফরের

অনুচরের অভাব নেই, এতো আপনার জানা উচিত নবাব সাহেব। তাই অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় এই পথে পথে ঘুরছি।

রমেশবাবু ভেতরে ভেতরে ভয়ানক রেগে গেলেন। পুলকটা হঠাৎ দরবেশের ভান করে যা তা বলা স্থুরু করে দিয়েছে, আর অলকটা বেরিয়ে আসছে না কেন। হতভাগাটা একটা কিম্ভুত কিমাকার অবস্থার সৃষ্টি করে ফেলছে যে। আর সতীশবাবুও হয়েছেন এমনি যে যবনিকাটা ফেলে দিয়ে এর একটা ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করতে দিচ্ছেন না। এদিকে যে সব মাটি হতে চললো।

পুলক ততক্ষণ বলে চলেছে, কি আর বলব দরবেশ তোমায়। সারা বাংলা ছেয়ে গেছে মীরজাফরের প্রতিচ্ছবিতে। বিশ্বাসঘাতকতার বহ্নি গ্রাস করে ফেলেছে এই বাংলার শান্তি নীড়। বাতাস হয়েছে এর বিষাক্ত ও কলুষিত। হিন্দু মুসলমানের মিলনভূমি এই বাংলা হয়েছে এক প্রেতভূমির মতো। জিঘাংসা পরায়ণ হয়ে এরা নিজেকে ভুলে যাচ্ছে। ইংরাজের ছলনায় ভুলে গেছে এরা এদের সাধের বাংলাকে। কোথা গেলে মীরমদন আর মোহনলাল? তোমাদের হতভাগ্য নবাবের জন্য শেষ রক্তদান করে গেছ, আর সে রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে বিশ্বাস-ঘাতকের দল। সমস্ত বাংলার স্বাধীনতাকে বলি দেবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে তারা। ভাবছে নবাবী তাদেরই হাতে থাকবে। মূর্খ তারা, বাংলার আকাশে ঘোর অমানিশার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

সমস্ত ভারতের আকাশ ছেয়ে যাবে এই অন্ধকারের কালিমায়। তোমাদের নবাবের সাধনা আর সফল হলো না, ডুবে গেল সে এই অন্ধকারের মধ্যে। যদি কখনো আলো ফুটে ওঠে, তখন সবাই বুঝবে তোমাদের নবাব কি ছিল! কিন্তু সেদিন কবে আসবে বলতে পার দরবেশ?

অলক অবাক হয়ে পুলকের এই দীর্ঘ স্বরচিত অভিনয় শুনছিল। সামনের দিকে এই অবসরে চেয়ে দেখল সবাই চোখের জল মুছছে। সেও মুগ্ধ হয়ে পড়লো। নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাহিনী সে ভাল ভাবেই পড়েছিল। উন্নত মহান্ নবাব চরিত্র পরিস্ফুট করবার এই সুযোগ সে ছাড়লো না। পুলকের অভিনয় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কুর্ণিশ করে মাথা দুলিয়ে জবাব দিয়ে উঠল, আসবে জাহাঁপনা আসবে, আপনার আমার জীবনে হয়তো তা প্রতিভাত হবে না। কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিছু বেশীদিন টিকতে পারে না। বাংলা আবার তার হৃত স্বাধীনতা ফিরে পাবে। সেদিন সবাই বুঝবে নবাবের শুভ প্রচেষ্টার ফলাফলের কথা। হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠবে স্বাধীনতার কলরোল, তাদের একান্ত আদরের নবাব সিরাজউদ্দৌলার জয়ধ্বনি। আশমান সে ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে। মীরজাফর উমিচাঁদের দল তখন বিলীন হয়ে যাবে। কবে

সে সুদিন আসবে সে আমি জানিনে জাহাঁপনা। আমি শুধু দেখছি অশান্তির প্রলয় হুঙ্কারে সমস্ত মেদিনী থর-থর করে কাঁপছে। হতভাগ্য বাংলা আর ততোধিক হতভাগ্য এর পোড়া দেশের অধিবাসী। বাংলার শেষ ভরসাস্থল তাদের নবাবকে কেউ বুঝেও বুঝলো না। ইংরাজের ছলনায় অবাস্তব আশায় তারা এ সোনার দেশকে তুলে দিল জাহান্নমের পথে। হিন্দু মুসলমানের তীর্থভূমি এই বাংলাদেশ তার শেষ স্বাধীন নবাবকে গেল ভুলে। তাকে পথের ভিখারী করে দিল। আমি কি ভাবছি জানেন জাহাঁপনা, বাংলা শুধু আপনাকে নিঃস্ব করেনি, নিঃস্ব করেছে সে তার নিজের সত্বাকে, মরীচিকার কুহকে পড়ে সে সব হারিয়েছে। এর প্রায়শ্চিত্ত যে কত বছর চলবে সেটা ভেবে আমার বুক ভেঙ্গে পড়ছে।

দর্শকেরা নির্ব্বাক হয়ে অভিনয় শুনে আসছিলেন। সমস্ত স্থানটায় একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যেন প্রত্যক্ষভাবে উদয় হয়েছেন এই ষ্টেজের মধ্যে, এমনি একটা ভাব যেন সবার মনে খেলে বেড়াচ্ছিল।

রমেশবাবু অলক পুলকের কীর্ত্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলে দুটো আগে থেকেই এগুলো মুখস্থ করে এসেছিল নাকি। এমন চমৎকার ভাবে বলে গেল যে স্কুলের ছেলের পক্ষে এটা কি করে সম্ভবপর হলো, তা তিনি

বুঝেই উঠতে পারলেন না। ঘটনাগুলো এমনভাবে ঘটে যাচ্ছে, যা মুখস্থ-করা অভিনয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

সতীশবাবু উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। মুগ্ধ হয়ে তিনি বললেন, বাঃ এরা দুই ভাইতো চমৎকার পার্ট করতে পারে—একটুও বাধছে না। অনর্গল বলে যাচ্ছে।

রমেশবাবু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, অথচ এর একটা কথাও আমার লেখা নয়। এ ওরা শুধু বানিয়ে বানিয়ে বলে চলেছে। কথার খেই হারিয়ে ছেলে দুটো গণ্ডগোল করে না বসে! হতভাগারা ফিরে আসার নামটী পর্য্যন্ত করছে না; বরং যবনিকা ফেলেই দিন।

সতীশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, না থাক্।

রমেশ বাবুর রাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে লাগল। দুটো ছেলের ডেঁপোমিতে এমন সুন্দর নাটকটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা ভেবে তিনি রাগে ভেতরে ভেতরে গুমরিয়ে উঠছিলেন। স্মারকের কাজ করছেন তিনি। আর ছেলে দুটো সেগুলো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না। একবার সিনটা উঠলে হয়। তারপর দেখে নেবেন অলকটাকে সবার আগে। ছেলে দুটোর পিঠে আস্ত একটা বেত ভাঙ্গলে তবে তাঁর রাগ যায়!

অলক একবার উইংসের দিকে তাকালো। রমেশবাবু কটমটভাবে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। হাত ইসারা করে অনতিবিলম্বে ষ্টেজের বাইরে যেতে নির্দ্দেশ করলেন। অলক ভাবলে, আর বেশীদূর অভিনয় এগোলে চলবে না।

ক্ষান্ত হবার সময় এসে গেছে। এরপর এগোলে রমেশবাবু হয়ত ষ্টেজের মধ্যেই ছুটে আসবেন। কিন্তু মাঝপথে বন্ধ করলে গণ্ডগোল হবে নিশ্চয়। রমেশবাবুও আর স্মারকের কাজ করছেন না। একটু চুপ করে অলক বলে উঠল, বান্দার সৌভাগ্য জাহাঁপনা আপনি এসে পড়েছেন। কিন্তু আপনার এখন ছদ্মবেশ ধরার একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে জনাব। আমার কুটীরে পদধূলি দিয়ে আপনার বেশ পরিবর্ত্তন করুন। আপনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি এখানেই অপেক্ষা করব।

পুলক সচকিত হয়ে উঠলো। তার পোষাক পরিবর্ত্তন করা একান্ত দরকার। অলক ষ্টেজে একটা ব্যবস্থা করে নেবে। এই সুযোগে পোষাকটা বদলে আসা একান্ত দরকার। অলক আবার বলে উঠল, জাহাঁপনা বোধ করি অভুক্ত আছেন। সামান্য কিছু আহারের ব্যবস্থাও এ-দীনের কুটীরে আছে।

গ্রীণরুমটা আবার যেখানে রমেশবাবু আছেন সেই দিক দিয়েই যাওয়া সুবিধা। পুলক কি যেন ভেবে সেই দিকেই অগ্রসর হলো। অলক বাধা দিয়ে বললে, জাহাঁপনা কি ভুলে যাচ্ছেন, আপনার শত্রু আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে সর্ব্বত্র। ওপথে যেতে গেলে আপনার বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে জনাব। আপনি যে পথে এসেছিলেন সেই পথে ফিরে গেলেই এ দীনের কুটীর পাবেন।

পুলক ষ্টেজের বাইরে যেতেই রমেশবাবু ঘুরে গিয়ে পুলককে ধরে নিয়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন ষ্টেজের ভেতর। শব্দ শুনে ষ্টেজের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, সিরাজউদ্দৌলা বন্দী হলো নাকি ?

অলক একটু চমকে উঠল, তারপর খানিক কি ভেবে গান ধরল ঃ

"ওরে ও ভ্রান্ত পথিক ! পথ ভুলে আজ চলিস্ কোথায় ?"

চমৎকার গলা। সুরের মূর্চ্ছনা ভেসে যেতে লাগল। একটা করুণ সুর সমস্ত ষ্টেজকে যেন কাঁপিয়ে তুলছিল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে গান শুনছিল। সতীশবাবু তাড়াতাড়ি একটা বাঁশী নিয়ে সুর যোগাতে সুরু করে দিলেন।

গ্রীণরুমে গিয়ে রমেশবাবু অলককে ছেড়ে দিয়ে বললেন, হতভাগা ইয়ার্কির আর বুঝি জায়গা পাওনি। তোমার থিয়েটারের পার্ট কখন শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন এসে আবার ষ্টেজের মধ্যে বিদ্যে ফলানো হচ্ছে। পুলক এখন করবে পার্ট আর তুই হতভাগা ষ্টেজের ভেতর গিয়ে ঢুকে পড়লি কেন ? গ্রীণরুমের মীরজাফর বলে উঠল, অলকটা ভারি বাচাল হয়েছে, আমাদের পার্ট নেই বুঝি। ক্লাইভ হেসে বললে, আর্দ্ধেক করেও ওর মন ওঠেনি। এখন পুলকের পার্টটাও ওই করতে চায়।

রমেশবাবু কান ধরে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। এখন

পোষাক ছেড়ে বাড়ী চলে যাও; নয় বাইরে গিয়ে বসো। ষ্টেজের মধ্যে তুমি থাকতে পারবে না। পুলকের পার্টটা আর নষ্ট করা চলবে না।

পুলক একটু ইতস্ততঃ করে বলে উঠল, স্যার, আমি চলে গেলে থিয়েটারটি মাটি হবে।

রমেশবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, না তা হবে না। যার যা পার্ট আছে, সেটা তারই করতে হবে। তোমার পার্টের পালা শেষ হয়ে গেছে এখন আর বাঁদরামো করতে হবে না। যথেষ্ট বাঁদরামি করেছো এতক্ষণ। এখন একবার পথ দেখ। পুলকের পার্ট ইনি করবেন, আবদার; তারপর ক্লাইভের দিকে তাকিয়ে বললেন, অশোক, অলকের পোষাকটা খুলে নিয়ে একে ষ্টেজের বাইরে রেখে এসো। খবর্দ্দার এ যেন আর ভেতরে ঢুকতে না পায়। আর পুলকটা ষ্টেজ ছেড়ে আসতে চাচ্ছেনা কেন? আবার গান ধরেচে। ওটাওতো কম দুষ্টু নয়।

অশোক পুলকের পোষাক খুলে ফেলতেই পুলক রমেশ বাবুকে লক্ষ্য করে বলল, স্যার আমায় একটা ছদ্মবেশ পরিয়ে দিন, অলকের গান থামলেই আমায় ষ্টেজে যেতে হবে।

রমেশবাবু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পুলক একটু হেসে বললে, আমিই পুলক স্যার, বিশ্বাস না হয় পোষাকটা ভাল করে একবার দেখুন। ওটা আমারই করবার কথা।

রমেশবাবু পোষাকটা নাড়াচাড়া করে বললেন, এ দুই যমজকে নিয়ে বড় মুস্কিল হলো দেখছি। অলকের গানও থামছেনা। অশোক তাড়াতাড়ি একটা আচকান আর দাড়ি বের করে দাও পুলককে।

পুলক ছদ্মবেশ পরে উইংসের পাশে এসে দেখলে অলক তার বিলম্ব দেখে বিভিন্ন রাগিণীতে সুরের খেলা সুরু করে দিয়েছে। সহসা সে থামবে বলে মনে হলোনা। শ্রোতারা যেন সুরের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। পুলক ফিরে এসে রমেশবাবুকে বললে, স্যার, অলকের চপগুলো।

রমেশবাবু ঠোঙ্গাটা তার হাতে দিয়ে বললেন, এগুলোর ব্যবস্থা করেই যাও। ষ্টেজের ভেতর গিয়ে আবার যে চপ চপ করে উঠবে, সে হচ্ছে না।

পুলক নিশ্চিন্ত মনে চপ খেতে সুরু করে দিলে। রমেশ বাবু সামঞ্জস্য রাখবার জন্য পার্টটার একটু অদল-বদল করে দিলেন। পুলক চপ খেতে খেতেই ঠিক করে নিলে সেটা।

এমনি সময় অলকের গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরে এলো। পুলকের চপ তখনও শেষ হয়নি। রমেশ-বাবুর সামনে সে চপগুলো আচকানের আড়ালে রেখে ষ্টেজের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দরবেশকে দু-একবার ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে চপ বের করে খাওয়া সুরু করে দিলে।

রমেশবাবু উইংসের ভেতর থেকে তাড়া দিতে লাগলেন।

তাড়াতাড়ি চপ মুখে পুরে পুলক উঠে দাঁড়ালো, তারপর অভিনয় চললো নিয়মমত।

যবনিকা পড়লো, আবার উঠলো কন্সার্টের পর। দেখা গেল নবাব এবার বন্দী অবস্থায় পড়ে আছেন। পোষাক তাঁর ছিন্ন ভিন্ন, পথের ভিখারীর ন্যায় তিনি ধুলায় পড়ে রয়েছেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

এদিকে মুস্কিলে পড়ে গেলেন রমেশবাবু। মোহম্মদী বেগের পার্ট যার করার কথা ছিল, তাকে এ সময় দেখতে পাওয়া গেলনা। রমেশবাবু সন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন, ভয়ানক পেট ব্যথা করছে বলে সে আগেই সরে পড়েছে। অনেক ডাকাডাকি করার পরেও তার সন্ধান পাওয়া গেলনা।

বরাবরই তার ক্লাইভ অথবা নবাবের পার্টটা নেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার অভিনয় নৈপুণ্য দেখে রমেশবাবু তাকে মোটে নিতেই চাননি, কেবলমাত্র ক্লাইভ আর মীরজাফরের অনুরোধে মোহম্মদী বেগের পার্টটা দিতে চেয়েছিলেন। ছেলেটি তৈরীও হয়েছিল এজন্য। সে যে শেষকালে একাণ্ড করে বসবে একথা রমেশবাবু ভাবতেই পারেননি। অন্য কেউ এ পার্ট নিলে তাদের আবার পোষাক বদলাতে হবে। তাই অলকের শরণাপন্ন হলেন তিনি। অলক একটু হেসে বললে, ভ্রাতৃ বধ হবে শেষে।

রমেশবাবু ধমক দিয়ে বললেন, নে তাড়াতাড়ি পার্টটা

শেষ করে দিয়ে আয়। এইটেই কিন্তু শেষপার্ট। ভাল করে অভিনয় করতে হবে।

অলক আবার মুসলমানী পোষাক পরে নিল। প্রকাণ্ড দাড়িটা মুনি ঋষিদের দাড়ির মতো ঝুলতে লাগল। এখন আর বেশী দেরী করবার সময় নেই। পুলকের পার্ট শেষ হয়ে গেছে। সে মশার কামড় খাচ্ছে বসে বসে। এখনই মোহম্মদী বেগের প্রবেশের কথা।

একখানা কুঠার হাতে অলক ঢুকে পড়ল ষ্টেজের মধ্যে। পুলক স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠে বললে, কে তুমি ভাই এ রুদ্ধ কারায়। অলক গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, চিনছো না আমায়। সব শেষ করে এসেছো কি না? এখন চিনবে কি করে?

পুলক বুঝলে অলক চপের কথা বলছে। ঠোঙাটায় অন্ততঃ একটা চপ অলকের জন্য রেখে আসা উচিত ছিল। হতাশের স্বরে সে বললে, কেমন করে চিনবো ভাই এই অন্ধকারে। তোমাদের নবাবের যে আজ কিছু নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। তাই এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নিরালা এক কোণে শান্তির নীড় খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। জনকোলাহলের বাইরে থাকবে সেস্থান, নীরব নিঝুম। হিংসার ছায়া সেখানে জাগাবে না জিঘাংসার মনোবৃত্তি, প্রীতি ও প্রেমের সংযোগে সেস্থান হয়ে উঠবে মহিমময়;—আর আমি বুনে চলবো কল্পনার প্রতিচ্ছবি—

অলক বলে উঠল, সে সুযোগ আমি তোমায় দেবো না নবাব।

পুলক বললে, জানি মোহম্মদী বেগ, জানি, তুমি যে চিরকাল আমার কাছে থেকে উপকার পেয়ে আসছ।

অলক পুলককে আক্রমণ করলে। আত্মরক্ষার প্রয়াসে পুলকের সরে যাবার কথা, কিন্তু ষ্টেজের তক্তায় পা বেধে পুলক গেল পড়ে। তাড়াতাড়ি কুঠার দূরে ফেলে অলক তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতেই দুজনে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল। অলকের আলগা দাড়ি গেল খসে। আবার ষ্টেজে দেখা গেল এক জোড়া নবাব। পুলক অভিনয়ের আর্ত্তনাদ করে উঠল। শ্রোতাদের একজন বলে উঠলেন, আরে মোহম্মদী বেগই যে খুন হয়ে গেল শেষে। সতীশবাবু তাড়াতাড়ি যবনিকা ফেলে দিলেন। যবনিকার অন্তরাল থেকে করুণ সুরে একটা গান ভেসে এলো। সুরের রেশ সকলের মনে বেশ দোলা দিয়ে গেল।

সকলে নির্ব্বাক হয়ে গান শুনতে লাগলেন। অলক পুলক তখন মহানন্দে রেস্তোরায় চপ ভোজনে লেগে গেছে।

—শেষ—